স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

সহায়ক পাঠক্রম-১ (প্রথম পত্র)

Subsidiary-I (First Paper)

(Political Theory and Institutions)

AMBITION

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **২০ x ২ =৪০**

ক) রাজনীতি চর্চায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করুন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রচেষ্টার ভিত্তিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম। জাপান, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে তত্ত্বটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯০৮ সালে আচরণবাদী আলোচনার সূত্রপাত করেন। আরনল্ড ব্রাস্ট তার Political Theory গ্রন্থে বলেছেন, আচরণবাদ হল রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এক অভিজ্ঞতাবাদী ও স্থায়ী তত্ত্ব গঠনের প্রচেষ্টা। টুম্যান এর অভিমত অনুসারে রাজনৈতিক আচরণ বলতে দেশ শাসনের পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও মিথোস্ক্রিয়াকে বোঝায়। তিনি রাজনৈতিক আচরণবাদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। (১) সুসংবদ্ধ গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং (২) অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উপর বিশেষ দৃষ্টি। ডেভিড ইস্টন তাঁর The Political System গ্রন্থে আচরণবাদকে "An Intellectual tendency and concrete academic movement." হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আচরণবাদীর উপর গুরুত্ব ঃ–

আচরণবাদে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণের পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণ তার ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তির আচরণ পরিবেশ নিরপেক্ষ হতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব। তার কোন আচরণেই তার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণের উপরই সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্ভাব্য অন্যান্য প্রভাবের আলোচনা আবশ্যক।

আচরণবাদী পদ্ধতি ঃ–

আচরণবাদীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতিতে এক প্রযুক্তিবদ্যাগত বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করেন। তারা ভৌতবিজ্ঞানের মতো আলোচনা ও বিশ্লেষণ কাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। পরীক্ষা ও সত্যতা প্রমাণ সম্ভব এমন অনুমান, প্রয়োগযোগ্য সংজ্ঞা, বৈধতা বিচারের মাপকাঠি প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা প্রভৃতির আচরণবাদে গ্রহণ করা হয়।

আচরণবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ–

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আচরণবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। আচরণবাদ আত্মসচেতনভাবেই তত্ত্বকেন্দ্রিক। তত্ত্বকে বাস্তবধর্মী গবেষণার দ্বারা যাচাই করতে হবে। আচরণবাদে তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২। আচরণবাদে অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্লেষণ থেকে নৈতিক মূল্যায়ণকে পৃথক করার কথা বলা হয়।

৩। আচরণবাদে ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর আচরণের তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাবাদীই বিশ্লেষণই মুখ্য লক্ষ্য বলে গণ্য হয়। এখানে ঘটনা, কাঠামো, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শের আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

৪। আচরণবাদ রাজনৈতিক আচরণ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনের পক্ষে। তথ্য, সংগ্রহ, শ্রেণীবিন্যাস, বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তথ্যের পরিমাপ ও সংখ্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৫। আচরণবাদ রাজনৈতিক তত্ত্ব ও গবেষণাকে সামাজিক মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করার পক্ষপাতী।

Edition 2017

৬। আচরণবাদীরা ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত যেকোন রাজকে রাজনৈতিক কাজ বলে গণ্য করেন। বরং এইরকম যেকোন কাজকে তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

৭। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, রাজনৈতিক আচরণগত সমস্যাদির বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

মূল্যায়ণ ঃ–

——— উপরিউক্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনের ক্ষেত্রে আচরণবাদী পন্থা পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নির্বাচন সম্পর্কিত আচরণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আচরণবাদী বিশ্লেষণের কার্যকারিতা অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক আলোচনায় আচরণবাদী তাত্ত্বিক বিপ্লব একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন হিসাবে বিবেচিত হয়।

তবে সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ আচরণবাদী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই বিপ্লবের অনুগামীরা সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ অনুশীলন ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। বর্তমানে মার্কিন মুলুকের দার্শনিক ও প্রতিষ্ঠানগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঘ) মার্কসীয় তত্ত্বে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণাটি বিশ্লেষন করুন।

উত্তর ঃ- **মার্কসবাদ ঃ -** এযাবৎকাল মানব সমাজের পরিবর্তন নিয়ে অনেক তত্ত্ব ও মতামত আলোচিত হয়েছে। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আলোকপ্রাপ্ত মনীষীগণ ইতিহাসকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। তারা নিজ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মানবজাতির ইতিহাসের পরিবর্তনের কারণ ও ধারা ব্যাখ্যা করেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার অভাবের জন্য অনেক তত্ত্ব নিছক কল্পনা বিলাসে পরিণত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কাল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ইতিহাস এবং তার পরিবর্তনের এক বৈপ্লবীক সূত্র মানবজাতিকে উপহার দিলেন।

তাঁদের এই বিপ্লবী মতবাদ বহু শতাব্দির ইতিহাসের উপরকরণ। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ, প্রকৃতিক বিজ্ঞানের অভুতপূর্ব অগ্রগতি চিন্তার জগতে নতুন উদ্যম ও উদ্যোগ সঞ্চারিত করল। পুঁজিবাদের বিকাশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চা ও অগ্রগতি সৃষ্টি করল নতুন এক জগৎ। এই পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে উঠল এক নতুন মতবাদ যা মানবজাতির মূল্যবান সম্পদে পরিণত হল। এই মতবাদ হল মার্কসবাদ। লেনিন উল্লেখ করেছেন, কাল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির নামই হল মার্কসবাদ। প্রকৃত পক্ষে, মার্কসবাদ বলতে একক ভাবে কালমার্কসের চিন্তাধারাকেই বোঝায় না। তার সহযোগী ফ্রেডারিক, এঙ্গেলস এবং উত্তরসূরী লেনিন, স্তালিন ও অন্যান্যরা নতুন পরিস্থিতির আলোকে মার্কসের চিন্তাধারাকে বিকশিত করেছেন। তাদের এই অবদান ও মার্কবাদের অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা ঃ- মার্কসবাদের ধারাসমূহকে কয়েজকটি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করিলাম। যথা –

i) **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঃ -**মার্কসবাদের ভিত্তিগত নীতিহল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্ববাদ হল সমাজ বিকাশের পূর্ণাঙ্গ, ব্যাপক এবনং সমৃদ্ধ তত্ত্ব। দ্বন্দ্ববাদকে মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় ধারণারূপে অতিহিত করা চলে। মার্কসবাদের তত্ত্বগত ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তবাদ। স্তালিন উল্লেখ করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদী, লেনিনবাদী পার্টির বিশ্ব বিন্যাস। এই বিশ্ব বিন্যাসকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়। কারণ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি, ওই ঘটনাবলীকে বিশ্লেষন এবং অনুদাবনের পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা, ওইসব ঘটনার সম্বন্ধে ধারণা এবং তার তত্ত্বহল বস্তুবাদী।

ii) **দার্শনিক বস্তুবাদ ঃ -** বিশ্ব প্রকৃতি বস্তু নিয়ে গঠিত। বস্তু জগৎ থেকেই চিন্তা, চেতনা ও ভার এর উদ্ভব ঘটে। বস্তু জগৎ সর্বদাই গতিশীল। প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তুই পরস্পরের সাথে যুক্ত। তাদের বিকাশ এবং রূপান্তর ঘটে। প্রাকৃতিক জগতের বিকাশের নিজস্ব নিয়ম না বিধি আছে। তা কোনো অধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বৈষয়িক জগতের দ্বন্দ্বের ফলেই তার পরিবর্তন ঘটে। বস্তুজগতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যেই পরিবর্তনের কারণ নিহিত। সুতরাং, বস্তুবাদ বলতে এমন একটি তত্ত্বকে বোঝায় যে তত্ত্বজগৎকে সামগ্রিকভাবে বস্তুরূপে গণ্য করে।

iii) **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঃ-** ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল মার্কসীয় দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মার্কস এঙ্গেলস ইতিহাস ও সমাজ পরিবর্তন, বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, বিকাশ, অগ্রগতি এবং বিকাশের মূলসূত্র বিশ্লেষন দ্বন্দ্বমূলক, বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি প্রয়োগ করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল মানবসমাজের উৎস, বিকাশ ও বৈপ্লবীর রূপান্তরের বিজ্ঞান। স্তালিন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সংজ্ঞানিরূপণ করেছেন সমাজ জীবনের অনুশীলনে দ্বন্দ্বময় বস্তুবাদের মূল নীতিগুলির প্রয়োজনকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, সামাজিক জীবন ধারা, সমাজ ও সমাজের ইতিবৃত্তের বিচারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতিগুলির ব্যবহারকে ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল লক্ষ্য হল কি কারণে এবং কিভাবে সামজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ এবং তার

AMBITION
Edition 2017

অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ফলে একটি আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ধ্বংস, সাধিত হয়। কিভাবে মানব সমাজ তার উন্নত থেকে উন্নতর আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় উপনীত হয় এবং মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ কিভাবে শোষনহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে তার কারণ ও প্রক্রিয়া বর্ণা করা। মার্কস এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তবাদের মাধ্যমে সমাজ বিকাশের মূল বিধির উৎপাদনম উৎপাদিত ব্যবস্থা, বিনিময়, শ্রেণি উদ্ভব, শ্রেণি সম্পর্ক এবং শ্রেণি সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন করেছেন। তারা অতীতের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা ও উপকরণ সংগ্রহের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমাজ বিকাশের বুনিয়াদ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের মধ্যেই নিহিত বৈষয়িক সম্পদের উৎপত্তিই হল সামাজিক বিকাশের নিয়মক শক্তি।

iv) **শ্রেণি সংগ্রাম ঃ -** মার্কসবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারা হল এই যে, শ্রেণি সংগ্রাম। শ্রেণি সংগ্রাম বলতে শোষক ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে সংগ্রামকে বোঝায়। শ্রেণী সংগ্রাম যদি মার্কসবাদের এক অপরিহার্য নীতি হয় তাহলে শ্রেণি সংগ্রাম বলতে কি বোঝায় ? লেনিন মতে, শ্রেণি হল এমন সব জনগোষ্ঠী, সামাজিক অর্থনৈতিক একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় পৃথক পৃথক অবস্থানের দরুন যার একটি অংশ অন্য একটি অংশের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে। এইভাবে সমাজের একটি অংশ যদি সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে নেয়, তাহলে অমারা জমিদার ও কৃষক শ্রেণিকে পাই। সমাজের একটি অংশ যখন সমস্ত কলকারখানা, শেয়ার ও পুঁজির অধিকারী হয় এবং অন্য অংশ তাদের জন্য শ্রম করে, তখন আমরা পাই পুঁজিবাদ ও শ্রমিক শ্রেণিকে।

সমস্ত সমাজে আত্মসাৎ কারী ছিল শোষক এবং কৃষকেরা ছিল শোষিত। আবার পুঁজিবাদি সমাজে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে বলে তাদের বলা হয় শোষক এবং শ্রমিকদের বলা হয় শোষিত শ্রেণী।

দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুবাদ এই দুইয়ের ওপর মার্ক্সীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। দ্বান্দ্বিকতা শব্দটির গ্রীক শব্দ dialego থেকে এসেছে, যার অর্থ হল তর্ক বিতর্ক। হেগেল মনে করতেন, যে, মানুষের চিন্তা রাজ্যে ভাবের জগতে বৈপরীত্য থাকার দ্বান্দ্বিক নিয়মে বিপরীত ভাবগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব তাই প্রগতির শর্ত। মার্ক্স দ্বান্দ্বিকতাকে ভাবের রাজ্য থেকে বার করে এনে বস্তুজগতে প্রয়োগ করেন এবং দ্বন্দ্ববাদ ও বাস্তু বাদের মিলণে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ রচনা করেন।

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্য –

(i) মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসারে বস্তুজগতের যাবতীয় ঘটনা ও বিষয় সমূহ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়, বরং তারা নিবিড় ভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

(ii) প্রকৃতি স্থিতিশীল বা স্থির নয়। বস্তু জগতের সর্বত্র পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে বিকাশ সম্ভব হয়।

(iii) দ্বান্দ্বিক নিয়মে এক অবাহা থেকে অন্য অবাহায় আমূল রূপান্তর ঘটে। বস্তুর প্রাথমিক অবহাকে বাদ এবং তার বৈপরীত্যকে প্রতিবাদ বলা হয়। বাদ ও প্রতিবাদের দ্বন্দ্বের ফলে সম্পূর্ণ নতুন অবাহায় সৃষ্টি হয়, যাকে মার্ক্স সম্বাদ বলেন। সম্বাদ যখন বিপরীত দুই শক্তির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে, তখন বস্তুর রূপান্তর ঘটে যা জটিল ও ব্যাপক। সম্বাদ বা নতুন অবাহা কিছুদিন পর বাদে পরিণত হয়, আবার প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। আবার সম্বাদ সৃষ্টি হয়। এই ভাবে দ্বান্দ্বিক নিয়মে সমাজ অগ্রসর হয়।

* প্রকৃতির সমান্ত বস্তুর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য দেখা যায়।

মর্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ইতিহাসে মানব সমাজের বিবর্তনকে গুরুত্ব দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হয় গতি, পরিবর্তন ও বিকাশ। মার্ক্সীয় ন্দন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিস্কার স্বীকার করে। এঙ্গেলস্ দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম গুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন –

পরিমান গত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের নির্ণয় – বস্তুর পরিমান গত ও গুণগত উভয় প্রকার পরিবর্তন ঘটে। উভয় পরিবর্তন সম্পর্ক যুক্ত এবং উভয়েই প্রগতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু গুণগত পরিবর্তনের ফলে বস্তুর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। যা পরিমানগত পরিবর্তনে ঘটে না। পরিমান গত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে সমাজ যখন উপস্থিত হয়। তখন সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে ও প্রগতি সাধিত হয়।

(i) বৈপরীত্যের সংগ্রাম ঐক্যের নিয়ম -

প্রতিটি বস্তুর অসংখ্য দিক আছে এবং এরা নিজেদের মধ্যে মিথক্রিয়ার শিপ্ত। মিথাক্রিয়ার ভিন্নমুখী কাজ ও গতিকে বৈপরীত্য বলা হয়। বৈপরীত্যের সংগ্রাম থেকে ঐক্য এবং ঐক্য থেকে প্রগতি ঘটে।

(ii) নেতির নেতিকরণ নিয়ম –

কোন কিছু বর্জন করাই হল নেতি। পুরাতনের জঠর থেকে নতুন জন্মায়। পুরাতনের নেতির দ্বারাই নতুনের আবির্ভাব সম্ভব হয়। নতুন পুরাতনের নেতির দ্বারাই নতুনের আবির্ভাব সম্ভব হয়। নতুন পুরাতনের থেকে অনেক বেশী সম্পূর্ণ ও উন্মত। মার্ক্সের মতে প্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস ও চিন্তার বিকাশের একটী সাধারণ নিয়ম তাকালে দেখা যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ে থেকে পরবর্তী পর্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছে।

AMBITION Edition 2017

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **১২ x =৩৬**

ক) সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বটি মূল্যায়ন করুন।

উত্তর ঃ- **একাত্ববাদী তত্ত্ব ঃ-** জাঁ বোঁদা, টমাস হবস, জন অস্টিন, প্রমুখ দার্শনিকদের দ্বারা পুষ্ট সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত একাত্ববাদী চিরায়ত একাত্ববাদী তত্ত্ব নামে পরিচিত। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত Leclvires in Jurisprudence গ্রন্থে অস্টিন সার্বভৌমিকরা সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও পরিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অস্টিনের সংজ্ঞানুযায়ী 'যদি কোনো সুনির্দিষ্ট উর্দ্ধতন ব্যক্তি অপর কোনো সুদ্যশ্য উর্দ্ধতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য আদায় করে তাহলে উক্ত সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হল সার্বভৌম এবং উক্ত সারভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সমাজ রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।' সার্বভৌমিকতা যেহেতু চরম, চূড়ান্ত, অভিভাজ্য তথা এক এবং এই ক্ষমতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত, সেহেতু এই তত্ত্বকে একাত্ববাদী তত্ত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার ভৌগলিক সীমার মধ্যেকার সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করে, কিন্তু অপর কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য দেখায় না। সার্বভৌমের আদর্শেই যেহেতু আইন, সেহেতু প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় নির্দেশ বা আইন মানতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাধিকারের প্রশ্নে বিরোধ, পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং তার বিকাশ ও রক্ষায় রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়ক এবং সর্বোপরি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমাযুক্ত, ভারতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভ এই প্রকাত্ববাদী রচনার প্রেক্ষাপট তৈরী করে।

বহুত্ববাদী সমালোচনা ঃ - সার্বভোমিকতা সম্পর্কে একাত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী তত্ত্বটি হল সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অবিভাজ্য ও অবাধ্য বলে যে দাবী একাত্ববাদীরা করে থাকেন, তারই প্রতিবাদস্বরূপ এই তত্ত্বের উদ্ভব। তবে এই তত্ত্বটি ও সমালিচানর উর্দ্ধ নয়।

প্রথমত ঃ ধারনার পৃথকীকরণ নেই ঃ- গেটেল তার মতে বহুত্বাবদে আইনগত এবং নৈতিক ধারনার মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারনা নৈতিক ধারনা নয়। সমাজের অন্যান্য সংগঠনগুলির ক্ষমতা ও স্বাধীকার নৈতিকভাবে সমর্থিত হলেও আইনগত ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ বিরোধ মীমাংসা ঃ- গেটেল আরো বলেন, সমাজে বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করার জন্য অধিকতর কোনো সংস্থার প্রয়োজন। বহুত্ববাদীগণ এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অর্পণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রকে এ ধরণের কাজ সম্পাদন করতে হলে অন্যান্য সংঘের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি ঃ - ফ্রান্সিস কোকার মনে করেন যে, বহুত্বাবদীদের বক্তব্য অনুযায়ি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত দিলেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভবপর হবে। কিন্তু এরফলে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

চতুর্থত ঃ স্ব বিরোধিতা ঃ- বহুতত্ববাদিদের তত্ত্বে স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। বহুত্ববাদীগণ ব্যক্তি আচরনের নিয়ন্ত্রনের জন্য আইনের প্রয়োজনকে স্বীকার করেন অথচ আইন প্রনয়নকারী সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন। বহুজাতিক সমাজে একই ধরনের আইন না থাকলে এবং আইনের উৎসমুখ এক না হলে পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেবে।

পঞ্চমতঃ শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ঃ ল্যাক্সির মতে, শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাই হেযেতু রাষ্ট্রের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় সেহেতু রাষ্ট্রকে অবিভাজ্য ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার দাবী করতে হয়।

বহুতত্ত্ববাদের এতসব সমালোচনা স্বত্ত্বেও তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ল্যাস্কি বহুত্ববাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেন। যথা -

১) রাষ্ট্র সম্পর্কে শুষ্ক আইনের কোন তত্ত্বই যে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়, বহুত্ববাদ তা তুলে ধরেছেন।

২) রাষ্ট্র আইনগতভাবে হলেও নৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারনে অন্যান্য সংঘের তুলনায় বেশী আনুগত্য দাবী করতে পারে না।

৩) রাষ্ট্রের ধারনা মূলত একটি ক্ষমতার ধারনা সুতরাং নৈতিক দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য নয়।

খ) ভিত্তি এবং উপরিসৌধের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- **ভিত্তি এবং উপরিসৌধের সম্পর্ক ঃ -** ঐতিহাসিক বস্তবাদের কাঠামোতে ভিত্তির অর্থহল উৎপাদন সম্পর্কের সামগ্রকরূপ। সমাজের এই অর্থণৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে মানুষের মতামত, মতাদর্শ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ইত্যাদি। এদেরকে সামগ্রিকভাবে উপরিসৌধ বলা হয়ে থাকে।

এঙ্গেল তার Anti Duhring গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করলাম।

AMBITION
Edition 2017

যথা -

i) উৎপাদন সম্পর্ক উপরিসৌধের পরিবর্তন সাধন করে। সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে, উপরিকাঠামোতে অবস্থিত মূল্যবোধ, রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি হল শ্রেণি সম্পর্কের প্রতিফলন।

ii) উৎপাদিকা শক্তি যেহেতু উপরিসৌধের চরিত্রকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে না, সেজন্য উৎপাদিত শক্তির পরিবর্তনের ফলে উপরিসৌধের ক্ষেত্রে সমান অনুপাতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

iii) অর্থনৈতিক ভিত্তি মানুষের ইচ্ছাব্যতীত গড়ে ওঠে। কিন্তু উপরি কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। উপরিকাঠামোর উপাদানের মৌলচরিত্র ঠিক করেছেন অর্থনৈতিক ভিত্তি।

vi) যতদিন পুরানো ভিত্তিটি অপরিবর্তিত থাকে, ততদিন উপরিসৌধতেও কোনও প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় না। সমাজের পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে গিয়ে নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠার সময়ে নতুন উপরিসৌধের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ইতিহাসের বাস্তবাদী ব্যাখ্যা ঃ - ইতিহাসের বাস্তবাদী বিশ্লেষনের মূলে আছে সমাজজীবন পরিবর্তনের বাস্তব ভিত্তির অনুসন্ধান। সমাজ জীবন বিভিন্ন প্রকার অবিচার, অসাম্য ও শোষণের মূল কারণ খুঁজতে হবে মনের সভ্যতার ইতিহাসের ভিতরে এই ধরনের কোন এক প্রতীতি থেকে জন্ম নেয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' সমাজ এবং ইতিহাসের এই বস্তুবাদী বিশ্লেষনেরই অন্যনাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসের লেখায় আমরা এই সংক্রান্ত আলোচনা প্রথম দেখতে পাই তার বিচ্ছিন্নতার সমস্যার প্রেক্ষাপটে রচিত Paris Manuscriptsa নামক গ্রন্থে। পরবর্তীকালে মার্কস এবং এঙ্গেলস এর যৌথ রচনাতেই আমরা এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা পেয়েছি যেমন The Holy Family এবং The German Ideology নামক গ্রন্থতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসকে দেখা হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং তার বিষয়গত পরিস্থিতির এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলসূত্রগুলি হল -

১) মানব সভ্যতার অন্যতম পরিণতি হল সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা। মানুষের দ্বারা এটা সম্ভব হয়, কেননা সে সৃজনশীল শ্রমের অধিকারী।

২) মানুষের তার আপন শ্রমের দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয় এবং একটি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা কায়েম করে।

৩) উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশীদার মানুষ এবং তার শ্রম শক্তির দিকে। এই শক্তি বিকাশের স্তর যত উন্নত হবে প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ তত বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেলিনের চিন্তাধারায়, বিকশিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ভিত্তিক উদার গণতন্ত্রের প্রকৃতি গত পার্থক্য বহু আলোচিত বিষয়। তবুও এই স্বল্প পরিসরে এই বিকল্পে গণতন্ত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পুঁজিবাদ গণতন্ত্রকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাজনৈতিক বিনাসের থেকে উন্নততর ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হলেও এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির 'সীমাবদ্ধতা' ও আনুষ্ঠানিকতার দিকেও এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ কারণেই যুক্তি দেওয়া হয় যে অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উহার গণতন্ত্র যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলে তা সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিষ্পষণের পরিমন্ডলে কখনই বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই কারণেই ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগসুবিধা সমাজের অধিপতি সদস্যরা ভোগ করেন অন্য দিকে, নিষ্পেষিত জনগণের কাছে এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফাঁপা প্রতিশ্রুতি তে পর্যবেশিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই যে সার্বজনীন নির্বাচন এ বিষয় আমরা পূর্বাংশে যে অংশগ্রহণের ব্যাপারটি এই বিকল্প চিন্তা ধারায় মেকি অংশ গ্রহণ বলে বর্ণনা করা হয়।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠের অংশ গ্রহণ সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে নতুন উৎপাদন ব্যবহারের মধ্যে নিজস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শোষণ মুক্ত শ্রমিক শ্রেণী ব্যক্তি মালিকানা বর্জিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদপায় চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথে জন্ম নেবে সাম্যবাদী সামাজিক স্বশাসন যার মধ্যে জনগণের শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এক নতুন মাত্রা লাভ করে এ পর্যায়ে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে রাজনীতির চিরাচরিত ভূমিকা ও লুপ্ত হবে।

ঙ) সাম্প্রতিক ভারতে সর্বোদয় আন্দোলনের প্রাক্যিকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

AMBITION
Edition 2017

উঃ - গান্ধী সর্বোদয় বলতে ব্যক্তির বৈষয়িক, আত্মিক সব দিক থেকে মঙ্গল অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের সুষম বিকাশ। সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই জাতীর মঙ্গলের কথা ভাবা হয়েছে।

'সর্বোদয়' বলতে সবার মঙ্গল। সর্বোদয় কে এমন একটি সমাজে বলা চলে যেখানে এক বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমাজ যেসব আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলি হলো অহিংসা, সাম্প্রীতি ও সাম্য, সকলের মঙ্গল, নতুন মূল্যবোধ, আত্মসংযম, কায়িক পরিশ্রম, বৃহৎ সরকারের পরিবর্তে গ্রামীণ সরকার বৃহৎ শিল্পের পরিবর্তে গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প। সর্বোদয়ের মূল কথা হল সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এই মানুষ বর্তমান যুগে আসাম্য, অবিচার ও অত্যাচারের কারণে তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

AMBITION

গান্ধীর অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রী করণের কথাও বলেছেন অর্থাৎ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রামস্তর থেকে রচনা করতে হবে। তাঁর মতে মানুষ আত্ম সংযম দেখিয়ে সহজ সরল জীবন যাপন করবে। বৈষয়িক বিষয়ে অতিরিক্ত লোভ শুধু নৈতিক দিক থেকেই ক্ষতিকারক নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও সংকট ঘণীভূত করে।

চ) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ- সাংগঠনিক বিচারে আইনসভা দু'ধরনের হতে পারে। একক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং দু'কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আইসভাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। Modern politics and Government গ্রন্থে অ্যানাল বল বলেছেন, ''Most Modern assembiles have two chambers, The mast prominent exeeption being Newteland.....Denmark ....Sweden'' দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে। উচ্চপরিষদের স্বপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সর্বাংশ সত্য নয়। উপরোউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গিয়ে বেন্থাস, ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ক) অনাবশ্যক ঃ - সুচিন্তিত আইনের জন্য দ্বিতীয় পরিষদ আবশ্যক। অন্যথায় অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণীত হতেপারে বলে যে যুক্তি দেখানো হয়, তা অভ্রান্ত নয়। কারণ বর্তমান কালের আইন প্রয়ন পদ্ধতি বিশেষভাবে দীর্ঘ এবং নানা পর্যায়ে বিভক্ত অধিকাংশ আইনের খসড়া প্রস্তাব সরকারের মূলনীতি অনুসারে আইনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয় এবং বিধি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্ক ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম সরকার পর পাশ হয়।

খ) দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তা কাম্য নয় ঃ- উচ্চকক্ষ একমাত্র কক্ষে স্বৈরা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বলে যে যুক্তির অবতারণা করা হয় তাও অবান্তর। কারণ জকনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট নিম্নক্ষ উচ্চকক্ষের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী।

গ) অগণতান্ত্রিক গঠন ঃ - দ্বিতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ হল এর গঠন অগণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে আইনসভা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের লর্ডসভার সদস্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করেন। আর ভারতের মত সংসদীয় শাসন দলীয় মন্ত্রীসভার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিগণই মনোনীত হওয়ার সুযোগ পান। সুতরাং, মনোনয়ন সূত্রে জ্ঞানীগুনী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ দ্বিতীয় কক্ষে সদস্যপদ লাভ করেন এও সঠিক নয়।

ঘ) শ্রেণী স্বার্থ প্রাধান্য পায় ঃ- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি হিসাবনে বলা হয় এই পরিষদ সকল শ্রেণি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই কাম্য নয়। কারণ এর ফলে জাতির বৃহত্তম স্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণি স্বার্থ প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় কক্ষের আলোচনায় জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থরক্ষা আগ্রহ বেশী প্রকাশ পায়।

Edition 2017

ঙ) সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার জন্যও অনাবশ্যক ঃ - সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক। কারণ সংবিধানের বিভিন্ন উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থবজায় রাখার ব্যবস্থা করা যায়।

ব) আইন প্রণয়নে বিলম্ব ঃ- দ্বিতীয় কক্ষ আইন প্রণয়ণকে বিলম্বিত করে। দুটি কক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তার ফলে প্রশাসন ব্যবস্থা শ্লথ গতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। আইনসভা তা দুটি কক্ষে বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ কোন বিশেষ বিষয়ে জনগণের ইচ্ছে দুটো রূপে প্রকাশিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই আইন বিভিন্ন ধারায় প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় কক্ষের গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে ও ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনীতিক বিবর্তনের একটি অঙ্গ হল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বর্তমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভারত অস্তিত্ব অব্যাহত আছে। বলের

মতানুসারে ''Itwowld seem that in the abserse of the development of some effeetive form of functional representotion, afderal strnctur eprovides the gretest relevance for seeond clom bers

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **৬ x ৪ =২৪**

ক) রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তু পরিবেশবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

কোনো রাজনৈতিক ঘটনা, সমস্যা বা বিষয় বিশ্লেষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় রাজনীতি বিজ্ঞানীগণ যে সমস্ত তালিকা পেশ করেছেন তা যেমন সম্পূর্ণ নয়। এই সমস্ত কালিকার বিষয় সূচিত সমরূপ নয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই রাজনীতি বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ বিশেষত জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি ও সূত্রসমূহ ব্যবহৃত হতে থাকে।

রাজনীতি বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বাস্তু পরিবেশবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ হলো—

১৯৬০-এর দশকের আগে পরিবেশ পরিমণ্ডল নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা হয়নি তা হয়। কিন্তু অধিকাংশ বক্তব্যেই প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য অফুরান যোগানদার হিসেবে। জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে ব্যক্তির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। উনবিশ শতকে কিছু দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক নির্বিচারে প্রকৃতিক লুন্ঠন করে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব, শিল্পায়ন ঘটেছে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন এবং রোমান্টিক অরণ্যের দিনে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে কোনো তত্ত্ব উদ্ভূত হয়নি। বেন্থাম, জেমসমিল প্রমুখ দার্শনিক ব্যক্তির সুশৃঙ্খলাকেই প্রধান বিবেচ্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং সুখলিপ্সাকেই চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতিকে বশে আনার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পায়ন, অরণ্য ও বন্য জন্তুর ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম হ্রাসমান অবস্থা, পরিবেশবাদ এক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এসময় জার্মানীতে রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব ঘটতে থাকে পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচী নিয়ে। বাস্তু পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। বাস্তু পরিবেশবাদীগণের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি ব্যাপ্যারে একমত দেখা যায়।

(১) বাস্তুপরিবেশবাদীগণ ষোড়শ–সপ্তদশ শতকের নবজাগরণ, জ্ঞানদীপ্তযুগের সাফল্যের মূল বক্তব্যের সমালোচনা কেন– ব্যক্তিকে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন জীব হিসেবে। প্রকৃতির প্রভু হিসেবে দেখার পরিবর্তে বিশ্ব পরিমণ্ডলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন।

(২) ব্যক্তিচর্চায় ব্যক্তিজীবনের সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগানকে অপর্যাপ্ত বলে ধরা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষে সৃজনক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সীমাহীন। বাস্তু পরিবেশবাদীরা এই ভাবনাকে সমৃদ্ধির বাতিক (Growth mania) বলে ব্যাঙ্গ করেছেন। প্রাকৃতিক সম্পত অপর্যাপ্ত নয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখান যে, যে হারে তৈল সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে বিশ্বের ৪৮-৮০ বৎসরের মধ্যে তৈল সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ না করলে ও জন্মহার নিয়ন্ত্রণ না করলে অচিরেও মানবসভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

(৩) বর্তমান প্রজন্মই সাধারণত মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাস্তু পরিবেশবাদীরা আগামী প্রজন্মের কাছেও দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ যদি এই প্রজন্মের বেহিসেবী ব্যবহারের ফলে শেষ হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা রেখে যাব এক সম্পদহীন, নিঃস্ব, দূষণপূর্ণ জগৎ।

(৪) বাস্তু পরিবেশবাদীরা শুধুমাত্র মানুষের পরিবর্তে অন্যান্য প্রজাতির সুখবৃদ্ধি ও যন্ত্রণালাঘবের বিষয়ঠির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে মানুষের মতো অন্যান্য জন্তুদেরও বাঁচার অধিকারের বিষয়টি রাজনাতিতে এসে যায়।

সর্বোপরি বাস্তু পরিবেশবাদীগণ রাজীতিকে মূল্য-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার পরিবর্তে মূল্য সাপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তুলতে চান। এ কারণে নৈতিক বিষয়টি বস্তু পরিবেশবাদীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, অন্যান্য প্রজাতির কাছে, মানবজাতির এক দায় আছে। এরজন্য মানুষকে তার ভোগস্পৃহা কমানো, সবার বাঁচার ও বিকশিত হওয়ার অধিকারকে মেনে নেওয়া।

ঘ) উদ্বৃত্ত মূল্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ- রিকার্তোর 'Labour theory of value' ও অপরাপর ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মার্কস 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ব নীতি' প্রচার করেন। দীর্ঘ নয় বছর গবেষণার পর ১৮৫৯ খ্রীঃ প্রকাশিত 'কনট্রিবিটশান টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থে তিনি প্রথম এই মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, উৎপাদনের বিবিধ উপাদান, অর্থাৎ তিনি কাঁচামাল, মূলধন, সবই প্রকৃতির দান। এর মালিক সবাই। শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই এগুলি সম্পদ বা সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়। শ্রমনিক বা মজুরি পায় তার চেয়ে সে অনেক বেশী উৎপাদন করে। এইভাবে সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত মূল্য। মার্কসের মতে, সকল প্রকার সম্পদ একমাত্র শ্রমের দ্বারাই পাওয়া যায়। সুতরাং, সম্পদ

AMBITION Edition 2017

শ্রমিকেরই প্রাপ্য।

ঙ) 'গিল্ড সমাজবাদ' কী ?

উত্তর ঃ-উত্তর ঃ- গিল্ড সমাজবাদের নীতিসমূহ হল

i) Functional Democracy -র নীতি ঃ– কোল এই নীতি শিল্প এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সকল গিল্ড সমাজবাদীরা অবশ্য এই নীতি গ্রহণ করেন না।

এই নীতিকে ব্যাখ্যা করে এভাবে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তি দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। সেজন্য অতীতের সর্ব তথাকথিত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠাই আসলে কিন্তু কার্যকরী ছিল না। কিন্তু একজন মানুষ তার প্রতিবেশীদের কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য তুলে ধরতেই পারেন।

সাধারণ উদ্দেশ্যের অন্তর্গত রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও আছে নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত স্বার্থ।

ii) রাষ্ট্রের মালিকানার নীতি ঃ- গিল্ড সমাজবাদ এর সাথে এখানে সংহতিবাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের ভাবনাকেও প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয় যে, ভারতীয় করনের মাধ্যমে সবধরনের শিল্প সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

চ). আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের দুটি কারণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশের শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে শাসন বিভাগের ক্ষমতার বিস্তার ঘটেছে এবং সেই সাথে আইন সভার ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে, বস্তুত আইন বিভাগের ক্ষমতার অবক্ষয়ের বিষয়টি আলোচিত হয় শাসন বিভাগের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণে।

হোয়্যার (K. C. Where) এর মতে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সমস্ত দেশেই আইন সভায় ক্ষমতা ঘাটতির দিকে। Anal Ball-এর মতে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল ও শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বিস্তার ও জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের প্রশ্নটি আলোচিত হচ্ছে।

বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিত্য নতুনসমস্যা ও সংকট, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মোকাবিলার দায়িত্ব এসে পড়ে শাসনবিভাগের হাতে। পররাষ্ট্র নীতি, সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়, অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনার বিষয়ে শাসন বিভাগের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শাসন বিভাগ দেশ ও জনগণনের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে শাসন বিভাগের এই প্রাধান্যমূলক ভূমিকাকে আইনসভা মেনে নেয়।

বর্তমান শতাব্দীতে আইনসভা শাসন বিভাগীয় সিদ্ধান্ত অনুমোদনের সংস্থায় পরিণত হয়েছে। কারণ হিসেবে ব্যবস্থার কঠোরতার কথা উপস্থাপিত করা যায়। কেননা আইন সভায় শাসক দলের সদস্যরা দলীয় নির্দেশ অনুসারে আলোচনা করেন ও কাজ করেন।

আইন প্রণয়নের বিষয়ে আইনসভার ভূমিকাও আনুষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন অধিকাংশ আইনের প্রস্তাব শাসন বিভাগ উত্থাপন করে। উত্থাপিত বিলের মধ্যে বেশিরভাগই হলো সরকারী বিল। অর্থসংক্রন্ত বিষয়ের উপরও আইন সভার রাশ আলগা হয়েছে।

এতদিন জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ও জনমত গঠনের ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। কিন্তু এখন বেতার, দূরদর্শন ওসংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলি জনমত গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা করছে। সেই কারণে আইনসভার গুরুত্ব কমছে।

জনকল্যাণূলক রাষ্ট্রে বহু ধরণের আইনের প্রয়োজন হয়। আইনের জটিলতা, আইনসভার সদস্যদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব এবং সময়ের অভাবের জন্য আইনসভা আইন প্রণয়নের বেশ কিছু ক্ষমতা শাসন বিভাগের হাতে অর্পন করে। শাসন বিভাগ প্রণীত এই ধরণের আইনকে অর্পিত আইন বলে। এর ফলে আইন সভার ক্ষমতা হ্রাস ও উল্টো দিকে শাসন বিভাগের ক্ষমতার বিস্তার ঘটেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চাপ, অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্বায়ন, পেশাগত সংগঠনের বিকাশ, দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব প্রভৃতি কারণে আইনসভার ক্ষমতা কমেছে যেমন বলা হয়, তেমনি একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সময়ের অভাব, আইন প্রণয়নের জটিলতা এবং আইনসভার সদস্যদের দক্ষতার অভাব আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসে সাহায্য করেছে। আর্থিক ক্ষেত্রেও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ যতটা আনুষ্ঠানিক ততটা কার্যকরী নয়।

AMBITION
Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

সহায়ক পাঠক্রম-২ (দ্বিতীয় পত্র)

Subsidiary-2 (Second Paper)

(Goverment and Politics in Europe and America)

AMBITION

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **২০ x ২ =৪০**

খ) ব্রিটিশ কংগ্রেসের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

উত্তর ঃ- মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। মার্কিন কংগ্রেস দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট উচ্চ কক্ষের নাম সিনেট এবং নিম্ন কক্ষের নাম জনপ্রতিনিধিসভা। উচ্চ কক্ষ সিনেট সমস্ত অঙ্গ রাজ্যের সমগ্র প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়। সেখানে ৫০টি অঙ্গ রাজ্যের প্রত্যেকটি থেকে দু জন করে প্রতিনিধি নিয়ে সিনেটের সদস্য সংখ্যা হল ১০০ জন। অন্যদিকে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি সভাগঠিত হয়। চার লক্ষ আশি হাজার জনসংখ্যা কিছু একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আঠারো বছর বয়স্ক যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের নাগরিক জন প্রতিনিধি সভার সদস্যদের নির্বাচিত করতে পারে। ১৯২৯ সালের একটি আইন অনুসারে জন প্রতিনিধিসভার সদস্য সংখ্যা ৪৩৫-এ নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এই সভার কার্যকালের মেয়াদ ২ বছর। অন্যদিকে, সিনেটের সদস্যরা ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি ২ বছর অন্ত এক তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হন। মার্কিন সিনেট স্থায়ী কক্ষ হিসাবেই গঠিত হয়েছে। এর সদস্য হতে গেলে কোন নাগরিককে অন্তত ৩০ বছর বয়স্ক হতে হয়। যেখানে জনপ্রতিনিধিসভায় সদস্যপদের যোগ্যতা ২৫ বছর।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ-

মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতাকে আইন প্রয়ণতা ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষমতার বিভক্ত করা যায়। আইন প্রয়ণন কংগ্রেসের প্রধান কার্য হলেও শুধু আইন প্রণয়নের সীমারেখার মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখা হয়নি। সংবিআানের প্রণেতাগণ পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণও ভারসাম্যের নীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের হাতে এমন অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছেন যাদের কোনক্রমে আইন প্রণয়ন মূলক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এই অবস্থা ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই অনেকে কংগ্রেসের ক্ষমতাও কার্যকালীকে প্রধানও দুটি ভাগে বিভক্ত করেন - ১) আবশিক্যক ক্ষমতা, (২) ঐচ্ছিক ক্ষমতা। যেসব কার্য সম্পাদন করা কংগ্রেসের পক্ষে বাধ্যতামূলক সেগুলিকে আবশ্যিক ক্ষমতা বলা হয়। ঐচ্ছিক ক্ষমতা হল সেই সব ক্ষমতা যা প্রয়োজনে কংগ্রেস ব্যবজা করতে পোারে। এই সব ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে কংগ্রেস বাধ্য নয়। কেউ কেউ আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে কংগ্রেসের ক্ষমতার কার্যাবলীর বিভাজন করেন। প্রথমতঃ- এখন কতকগুলি কার্য আছে যেগুলি কংগ্রেস সম্পাদক করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে যুদ্ধের ঘোষণার ক্ষমতা, মুদ্রা প্রলয়ন, ইত্যদি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত- ওজন মাপ, নির্ধারণ ইত্যাদি এমন কতকগুলি ক্ষমতা রয়েছে যেগুলি কংগ্রেস এককভাবে ভোগ করে না, কংগ্রেস এবং অঙ্গ রাজ্যগুলির আইনসভা সমূহ এগুলি ব্যবহার করতে পারে। আমরা কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে সাতটি ভাগ বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। যথা- (১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৪) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৫) বিচার সংক্রান্ত সমস্যা, (৬) নির্দেশগত তত্ত্বাধান সাংবিধানিক ক্ষমতা, (৭) তদন্ত করার ক্ষমতা।

Edition 2017

১। আইন প্রয়ণ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- জাতীয় আইন সভা হিসাবে কংগ্রেসের প্রধান কাজ হল আইন প্রনয়ন করা। কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে রূপান্তরিত হতে পারে না। কংগ্রেসের এই ক্ষমতাকে দুটিশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা (খ) অন্যান্য ক্ষমতা। সংবিধান আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যেভাবে ক্ষমতা কংগ্রেসকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান করেছে সেগুলিকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বলা হয়।

এরূপ ক্ষমতা ছাড়ও শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতি বিচারালয়ের মাধ্যমে কংগ্রেস আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের ক্ষমতার মধ্যে অনুমতি ক্ষমতা অন্তরনিহিত ক্ষমতা এবং জরুরী ক্ষমতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। জাতীয়স্বার্থে প্রয়োজন হলে কংগ্রেস যে সব

বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেগুলিকে অনুমতি ক্ষমতাবলে প্রণিত আইন বলা হয়। অন্তনিহিত ক্ষমতাবলে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকারী। তাছাড়া জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য কংগ্রেস বিশেষ ধরণের আইন প্রণয়ন করতে পারে।

২। সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সংবিধানে বলা হয়েছে, কংগ্রেসের উভয় পক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় কিংবা দুই তৃতীয়াংশ অঙ্গ রাজ্যের আইন সভার সমূহের অনুরোধ ক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহুত একাধিক কনভেনশন সংবিধান সংশোধন প্রস্তান উত্থাপিত হতে পারে। ওই প্রস্তাব অঙ্গ রাজ্যের দিয়ে আইন সভা সমূহের চতুর্থাংশ কর্তৃক কিংবা উক্ত উদ্দেশ্যে অঙ্গ রাজ্য সমূহে আহুত কনভেনশনের তিন চতুর্থাংশ কর্তৃক অনুমোদিত হলেই কেবলমাত্রা গৃহীত হতে পারে। সংবিধান সংশোধনের এই পদ্ধতি বিষয়ে বিশ্লেষন করেছেন এককবাবে কংগ্রেস সংবিধান করতে পারে না। তার সম্মতি ছাড়া সংবিধানের কোন অংশেরই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন পদ্ধতিতে সংশোধন কার্যচলবে তা কেবল মাত্র কংগ্রেসই নির্ধারণ করতে পারে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- কংগ্রেসের নির্বাচন কংগ্রেসন্ত ক্ষমতাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন কোন প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ অর্জন করতে না পারলে তাদের নির্বাচিত করার দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর বর্তায়। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীরে মধ্যে একজনকে জন প্রতিনিধি সভা রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করতে পারে। অনুরূপভাবে সিনেট উপরাষ্ট্রপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন প্রার্থির মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করতে পারেন। তাছাড়া কংগ্রেস আইন প্রনয়নের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যদের নির্বাচনের স্থান সময় নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির করে দিতে পারে। এমনকি সদস্যপদের যোগ্যতা ও নির্বোচনে যৌক্তকতা বিচার করার ক্ষমতাও কংগ্রেসের রয়েছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের কংগ্রেসের যেকোন সদস্যকে সভার অনুপযুক্ত বলে ঘোষনা করার অধিকারী। নির্বাচনী প্রচারে অস্বাভাবিক পরিমান অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ এনে তাকে সভাকক্ষে আসন গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

৪। শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- কংগ্রেসের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা হলেও শাসনসংক্রান্ত কিছু ক্ষমতাও তার রয়েছে। রাষ্ট্রপতির এককভাবে সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদন করার অধিকারী হলেও সিনেটের অনুমোদন ছাড়া সেগুলি কার্যকরী করা যায় না। রাষ্ট্রপতি উইলসন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করলেও সিনেট অনুমোদন না করায় তা কার্যকারী হয়নি। তাছাড়া সিনেট রাষ্ট্রপতি নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষতাকে নিয়ন্ত্রির করতে পারে। এছাড়াও শাসন বিভাগের দপ্তর সমূহের সংগঠন, ক্ষমতা ইত্যাদী কংগ্রেস প্রণিত আইনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সর্বোপরি কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই রাষ্ট্রপতি একক কপরদক পরিমান অঙ্গ অর্থ ব্যয় করতে পারে না।

৫। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রতপ অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট বা অভিযোগ অনয়নের মাধ্যমে বিচার করতে পারে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিসভা অভিযোগ আনয়ন করে এবনং সিনেটে তা বিচার বিবেচনার পর দু তৃতীয়াংশের অনুমোদিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয়। এছাড়া কোন সদস্য আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ তা বিচার করেন। তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সেই সদস্যকেও বহস্কার করতে পারে। এমনকি কোন কক্ষের সদস্য নয় এ রীপ কংগ্রেসের কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করলে কিংবা বাধা দান করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ তাকে শাস্তি দিতে পারে।

৬। নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- দেশের প্রশাসনের দপ্তর ও এজেন্সিগুলির তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকলেও কেবলমাত্র কংগ্রেসই এইসব দপ্তর বা এজেন্সীগুলি গঠন করতে পারে। বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক দপ্তর কমিশন, এজেন্সির প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অরআত কংগ্রেস অনুমোদন করে। সর্বোপরি কংগ্রেস প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সময় আইন প্রয়ণ করে প্রশাসনিক দপ্তর সমূহকে তাদের কার্যাবলী সমূহের রিপোর্ট কংগ্রেসের সামনে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। এভাবে কংগ্রেস প্রশাসনিক যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭। তদন্ত করার ক্ষমতা ঃ- শাসন বিভাগকে সাধারন করতে না পারলেও কংগ্রেস বা সিনেট শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে যে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনী অভিযোগের তদন্ত করতে পারেন। সংবিধানের গণ্ডির মধ্য থেকে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে বিস্মিত না করে কংগ্রেস জনস্বার্থেই কেবলমাত্র এরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজ যে তদন্ত করার ক্ষমতা কংগ্রেসের কোন শাসনতান্ত্রিকক ক্ষমতা নয়। এরূপ ক্ষমতা অনুমতি ক্ষমতা মাত্র।

অন্যান্য ক্ষমতা ঃ- এছাড়াও কংগ্রেসের আরও কিছু কার্য রয়েছে সংবিধানের ১/৪নং ধারা অনুসারে। সামরিক অভ্যুত্থান দমন, সামরিক বাহিনির শৃঙ্খলা রক্ষা, ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধঘোষণা প্রতিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনম আদেশ দিতে পারেন না।

পরিশেষে কংগ্রেস প্রতিনিধি সভা হিসাবে প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যেরও দায়িত্ব পালন করে থাকে।

AMBITION
Edition 2017

প্রত্যেক সদস্য কেবল দলীয় সমর্থকদের উপর নয় নির্বাচন কেন্দ্রের জনসাধারণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল থাকে। এই কারণে নির্বাচক মণ্ডলীর বক্তব্য বা দাবী দাওয়া সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন থাকতে হয়। এবং নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব তাদের করতে হয়।

গ) ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব আলোচনা করুন এবং এই প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর পদমর্যাদার একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে স্বীকৃত ফরাসী রাষ্ট্রপতির ভুমিকা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। এই বিতর্কের মূল কারণ ১৯৫৮ সালের সংবিধানের প্রকৃতুর মধ্যে বর্তমান। এই রকম একটি ক্ষেত্র হল রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেরাষ্ট্রপতির ভুমিকা ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতিশাসিত ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান ঃ- ফরাসী সংবিধানের পক্ষের প্রবক্তাদের অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রপতি হল;;নে রাষ্ট্রের প্রধান। দেশের মৌলিক আইনের বক্তব্য ও অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসারে রাষ্ট্রপতির ভুমিকা হন রাষ্ট্রপ্রধানের ভুমিকা। বিশেষত, স্বাভাবিক অবস্থায় একথা সত্য।

দ্বৈত শাসন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ঃ- সংবিধানের সমর্থকদের অভিমত অনুসারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামোর ভিত্তিতেই ফৰাসী রাষ্ট্রপতির ভুমিকা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবিদানে রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভার কথা বলা হয়েছে। সরকারের নিতি নির্ধারণ ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভাকে। এই মন্ত্রীসভাকে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় সভার কাছে দায়িত্বশীল করতা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার।

কর্তৃত্ব সম্পন্ন রাষ্ট্রপতি ঃ- কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবলী সংবিধান বিশ্লেষকরা ভিন্ন কথা বলেন। তাঁদের মতানুসারে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে তার মনোনীত সহযোগী হিসাবে মনে করেন। তিনি রাজত্বও করেন এবং শাসনও করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিদানে রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি ব্রিটেনের রাজা বা রাণী অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো নিতান্তই একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নন।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে বহু ও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আগেবাকার কোন সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে এত ক্ষমতাশালী করা হয়নি। নিম্নে উক্ত ক্ষঢ়তাগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলাম, যার সাহায্যে গুরুত্বগুলি সম্পর্কে অবতীর্ণ হবো-

১। প্রধানমন্ত্রি মনোনয়নের ক্ষমতা- দেশের মন্ত্রীসভার উপর ফরাসী রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত তিনি ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের উপর তিনি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধামন্ত্রির আহ্বাণ অত্যন্ত জটিল। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করতে প্রধানমন্ত্রী বাধ্য। অন্যথায়, তাঁকে পতনের আশংকায় ভুগতে হয়। বর্তম,ান সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করণতেন। প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হল স্বেচ্ছাধীন।

প্রতি স্বাক্ষর সম্পর্কিত সংবিধানিক ব্যবস্থা ঃ- রাষ্ট্রপতির উপর প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রতি স্বাক্ষরের বিষযটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের মনোনয়ন ও অপসারণ, গণভোট, জাতীয়সভার বাতিল করে।

গর্ভমেন্ট সম্পর্কিত সংবিধানিক ব্যবস্থা ঃ- গণভোট সম্পর্কিত ক্ষমতা ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংবিদান ৩নং ধারা অনুসারে জাতীয় সার্বভৌম জনগণের হাতে ন্যস্ত আছে। জনগণ তাদের এই ক্ষমতা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বা গণভোটের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে।

জাতীয় সভাকে বাতিলকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা ঃ- ফরাসী রাষ্ট্রপতি তাঁর ব্যক্তিগত সিদআদান্তের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয়সভাকে ভেঙে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীস সাথে সিনেটের ও জাতীয় সভার সভাপতিদের সাথে তার পরামর্শের বিষয়টি নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক বিষয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অন্য কোন কর্তপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। পৰাসী রাষ্ট্রপতি জাতীয় সভাকে বাতিল করণ সম্পর্কিত তাঁর ক্ষমতাকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।।

জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষঢ়তা ঃ- ফরাসী সংবিধানের ১৬নং ধারায় রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আলোচনা করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আইনসঙ্গতভাবে একনায়তন্ত্র কায়েম করতে পারেন। জরুরী অবস্থা জারী করার ব্যাপারে, সংবিধান অনুসারে, রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী সিনেটের সভাপতি, জাতীয় সভার সভাপতি ও শাসনতান্ত্রিক পরিষদের সভাপতির সাথে পরামর্শ করতে হয়।

শাসিলি ক্ষমতা ঃ- ১৯৫৮ সালের সংবিধানের ৫নং ধারায় ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে সালিশী বিচারক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দেশের শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য রাষ্ট্রপতির সরকারী সংস্থাসমূহের নিয়মিত কার্যকারীতা ও স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সালিশি বা মধ্যস্থতার ভুমিকা পালন করতে হয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার রক্ষক হলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর উপরই ন্যস্ত

AMBITION
Edition 2017

আছে কমিউনিটি সম্পর্কিত যাবতীয় চুক্তি মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব।

রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন - প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন নির্বাচনের মাধ্যমে ফরাসী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। পঞ্চম সাধারনতন্ত্রের সংবিধানে প্রত্যক্ষ সার্বাঙ্গীণ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার কথা বলা হয়েছে। তার ফলে ফরাসী রাষ্ট্রপতি নিজেকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেন।

উপসংহার ঃ- সর্বোপরি বলা যায় যে, ১৯৫৮ সালের সংবিদানে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত এই দুই বিপরতীথ প্রকৃতির গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রণে ঘটেছে। এই শাসন ব্যবস্থায় সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদ এবং একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রপতির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। এই ঐত্যহ্যবাহী শাসন ব্যবস্থায় ফরাসী রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাই ফরাসী শাসন ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভুমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

AMBITION

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **১২ x =৩৬**

ক) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

ব্রিটেনে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল প্রথার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ব্রিটেনের দলীয় ববস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১) ব্রিটেনে সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। অ্যালমন্ড (Almond) গ্রেট ব্রিটেনের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনা করেছেন এবং ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে 'সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা' (distinct Bi-party System) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটেনে দু'টি মূল দল ছাড়াও ছোটখাট আরও দু-একটি দল আছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধানত রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নির্বাচনী রাজনীতিতে অন্যান্য দলগুলির অস্তিত্ব ও ভূমিকা গুরুত্বহীন। দু'টির বেশী রাজনৈতিক দল থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাত্র দু'টি দলের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত দু'শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্রিটেনে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব সময়ই দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে চলে আসছে। গোড়ার দিকে 'টোরী' (Tory) ও 'হুইগ' (Whig), তারপর 'উদারনৈতিক' (Liberal) ও 'রক্ষণশীল' (Conservative) এবং এখন রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই শ্রমিক দলের উদ্ভবের ফলে ব্রিটেনে ত্রি-দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু উদারনৈতিক দল ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ায় সেই সম্ভবনা আর নেই। ফাইনার (S.E. Finer)-এর মতানুসারে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা ব্রিটেনের সাসনতন্ত্রের স্বরূপ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন : "The two-party system is the key to the understanding how the constitution really works."

২) **মুখ্য দল দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই ঃ–** ব্রিটেনের দু'টি মুখ্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শাগত তেমন কোন মৌলিক পাথার্ক্য পরিলক্ষিত হয় না। রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে সীমিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায় তা বাহ্যত। উভয় দলের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে। কোন দলই বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও মুখ্য দল দু'টির মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য বর্তমান। প্রয়োজনীর সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের নীতিতে প্রধান দলগুলি বিশ্বাসী। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়ে উভয় দলই সমমতাবলম্বী। ব্রিটেনের মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমজাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করেছে।

৩) **দলীয় শৃঙ্খলা ঃ–** গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই শৃঙ্খলাবোধ দ্বি-দল ব্যবস্থার অন্যতম সাংগঠনকি ভিত্তি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক দলের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। দলের আঞ্চলিক ও সাখা সংগঠনগুলিকে এবং দলের সংসদীয় শাখাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশকে মান্য করে চলতে হয়। দলীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেবে। তাই দলত্যাগ ও দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে পার্লামেন্টে ভোটাভুটির নজির বড় একটা নেই।

৪) **দলীয় ব্যবস্থার ভূমিকার গুরুত্ব ঃ–** ব্রিটেনে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্র হিসাবে দলীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের চেহারা-চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারায় দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। ইংল্যান্ডে রাজা বা রানীর কর্তৃত্বকে অপসারিত করে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা,

Edition 2017

তারপর পার্লামেন্টের প্রাধান্যের জায়গায় ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব কায়েম এবং চূড়ান্তভাবে ক্যাবিনেটের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় দলীয় ব্যবস্থাই কার্যকরী ও অর্থবহ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৫) ব্রিটেনের সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও বূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এতদ্সত্ত্বেও ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার পিছনে কোন আইনগত স্বীকৃতি নেই।

৬) **সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার গঠনই লক্ষ ঃ–** ব্রিটেনের মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পদ্ধতিতে রাজনৈতিক তথা সরকারী ক্ষমতা দখল করতে চায়। কোন দলই ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে অসাংবিধানিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়জয়লাভ করা এবং সরকার গঠন করে দলীয় কর্মসূচীকে কার্যকর করা।

৭) **কর্মসূচীভিত্তিক দল ঃ–** ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি মূলত কর্মসূচীভিত্তিক। প্রত্যেক দল নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে দলীয় ক্রমসূচী ঘোষণা করে। দলীয় কর্মসূচী প্রচারের মাধ্যমে প্রতিটি দল ভোটদাতাদের ভোট কামনা করে। দলীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতেই নির্বাচন হয়। এবং যে দলের কর্মসূচী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতার সমর্থন লাভ করে সেই দলই সরকার গঠন করে।

৮) দলগুলি শ্রেণীভিত্তিক নয় ঃ– ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি শ্রেণীভিক্তিক বলা সঙ্গত নয়। শ্রমিক দল মূলত শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট। কিন্তু রক্ষণশীল দল সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থন লাভ করে থাকে। রক্ষণশীল দলের পিছনে অভিজাত, বিত্তবান ও সামন্ত শ্রেণীর সমর্থন আছে। তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশেরও সমর্থন আছে। আবার শ্রমিক দল হল মূলত শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট দল। কিন্তু এ দিলের পিছনে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-বিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের সমর্থন আছে। আবার শ্রমিক দল হল মূলত শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট দল। কিন্তু এ দিলের পিছনে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের সমর্থন আছে। তবে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মধ্যে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পার্থক্য নেই তাও বলা ঠিক হবে না. প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি মূলত নির্বাচনকেন্দ্রিক। তাই রাজনৈতিক দলগুলি শ্রণীগত কোন চরম পথে পা বাড়ায় না। বরং নির্বাচনী কৌশল হিসাবে তার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এর উদ্দেশ্য হল সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগণের সমর্থন লাভ করা।

৯) **পারস্পরিক সহযোগিতা ঃ–** ব্রিটেনে সরকারী দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ক্ষমতাসীন দল শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটিতে বিরোধীদলের নেতাদের স্থান দেওয়া হয়। তেমনি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন বিষয়ে সংকটের সময় বিরোধী দল সরকারী দলের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে।

১০) ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলির কেন্দ্রিয় সংগঠন অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। দলীয় ক্ষমতার অধিকাংশই এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। তার ফলে দলের আঞ্চলিক সংগঠনগুলি দুর্বল হয়।

১১) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যায়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট একাধিক পেশীদারী গোষ্ঠী ও শাসক সংগঠন থাকে।

খ) ব্রিটিশ কমন্স সভার স্পীকারের কার্যাবলী ও ভূমিকা বিশ্লেষন করুন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এর নিম্ন কক্ষের নাম কমন্স সভা (House of Commons) কমন্স সভা হলো জনপ্রতিনিধিত্ব সভা। স্পীকার হলেন সমন্স সবার সভাপতি। তিনি সভার প্রাত্যহিক আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করেন। তাছাড়া কোনো বিষয়ের উপর বিতর্কের সময়ও তিনিই ঠিক করে দেন। স্পীকার এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতার সাথে আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া সভার কাজকর্ম নির্দিষ্ট নির্ঘন্ট অনুসারে এবং সুষ্ঠভাবে সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্য তিনি ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের মুখ্য সচেতকদ্বয়ের সাথে প্রয়োজন মতো পরামর্শ করেন।

Kangaroo Closure হলো সভার আলোচনার নিয়ন্ত্রন বা বন্ধ করার ব্যাপারে একটি স্বীকৃত উপায়। Kangaroo Closure বলতে স্পীকারের একটি পদক্ষেপকে বুঝায়। কমন্স সভার স্পীকার কোন একটি প্রস্তাব বা বিল আলোচনার প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বা বিলের অংশ বিশেষ বা সেই সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবের অংশ বিশেষ নিজের বিচার-বিবেচনাগত আলোচনার সুযোগ দিতে পারেন। এই ভাবে স্পীকার সভার আলোচ্য বিল বা প্রস্তাবের ালোচনাকে সংক্ষিপ্ত করেন।

প্রত্যেক বিষয়ের উপর আলোচনা ও বিতর্ক পূর্ব নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে সম্পন্ন হয়। আলোচনা শেষ হলে বিষয়টির উপর ভোটাভুটির ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তুর উপর ভোট নেওয়া হয়না। সাধারণ কোনো প্রস্তাব বা বিলের উপর ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটাভুটির পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা শেষ হয়। স্পীকার ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন।

AMRITON Edition 2017

ভোটাভুটি ছাড়া আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব বা ক্লোজার মোশন (Closure Motion) এর মাধ্যমের উপর আলোচনার সমাপ্তি ঘটতে পারে। কোনো একটি বিষয়ের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা চলতে থাকলে সভার যে-কোনো সদস্য সেই দীর্ঘয়িত আলোচনা বন্ধ করার প্রস্তাবের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। সভার অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাবটিকে সমর্থন করলে স্পীকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার সমাপ্তি ঘটনা।

কমন্স সভার আলোচনাকে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে রাখার জন্য এবং নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচী অনুসারে সভার আলোচনাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য স্পীকার অন্যান্য ারও কিছু ব্যবস্থা গ্রহম করতে পারেনা। কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা যাতে আকারণে দীর্ঘায়িত না হয় বা সদস্যরা সভার সময়ের অপব্যবহার করতে না পারেন, সে বিষয়ে স্পীকারকে সতর্ক থাকতে হয়। এই কারণে স্পীকার আলোচ্য বিষয় বা প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশের জন্য আলোচনার সময়-সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তদনুসারে নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হয়ে গেলেই সংশ্লিষ্ট বিষয় বা প্রস্তাবের এক একটি অংশের আলোচনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। কমন্স সভার স্পীকারের এই পদ্ধতিকে 'গিলোটিন' (Guillotine) বা "Closure by compartment" বলে।

ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টকে নাগরিক অধিকার রক্ষক বলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট হলো মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আদালত। একে মার্কিন জাতির সর্বোচ্চ আদালত বলা হয়। হাডসন (Hudson) বলেন "The supreme court of the United States is he only Federal Court set up by the constitution itself ... It is the highest court in the Nation".

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে "নাগরিক অধিকার সমূহের সংরক্ষক" বলা হয়। মূল সংবিধানে নাগরিক অধিকারের উল্লেখ ছিলনা, কিন্তু সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নাগরিকরা যে সকল অধিকার ভোগ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনাত, ধর্মের অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা ইত্যাদি।

মার্কিন নাগরিকদের ওইসব অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন সভার বা কেন্দ্রিয় বা রাজ্য সরকারের কোনো আদেশ বা নির্দেশকে নাগরিক অধিকার বিরোধী মনে করলে সুপ্রীম কোর্ট সেগুলিকে বাতিল করে দিতে পারে।

1895 সালে পোলক বনাম ফারমার্সলোন আন্ত ট্রাস্ট কোম্পানীর মামলায় আয়কর ধার্য করাকে সম্পত্তি শালিদের ওপর অত্যাচার বলে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে। দীর্ঘ কাল ধরে সুপ্রীমকোর্ট সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার বিরোধী অনেক রায় প্রদান করেছে।

নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আইন ও শাসন বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে অধিকার গুলি সংরক্ষক সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্ব। মার্কিন কংগ্রেসের কোন আইন বা শাসন বিভাগের কোনো সিদ্ধান্ত নাগরিকদের বিধিবদ্ধ অধিকারের বিরোধী হলে সুপ্রীম কোর্ট সংশ্লিষ্ট আইন বা সিদ্ধান্তকে বাতিল করে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

একথা ঠিক যে, নাগরিক অধিকার সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে 1936 সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট বিত্তবানদের সম্পত্তি গত অধিকার সরকারের নিয়ন্ত্রন থেকে রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মার্কিন সুপ্রীমকোর্ট এই সময় সাধারণ ও শ্রমজীবি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হলো শ্রমিকদের কাজের সময় সীমা বেঁধে দিলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে।

সুপ্রীম কোর্ট সরকারের স্বৈর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রনের হাত থেকে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তৎপর হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার জন্যই যে সরকার সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিক অধিকার সংকুচিত করতে পারেনি একথা অস্বীকার করা যায়না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের অধিকার ও মর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রাউন বনাম টোপেকার শিক্ষাপর্ষদ (1984) মামলায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়দের জন্য আলাদা বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা "আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার"-এর বিরোধী হবে।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলি Bill of Rights নামে পরিচিত। তাছাড়া শাসনতন্ত্রের অন্যান্য অংশও কিছু অধিকারের উল্লেখ আছে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা বা অব্যাহতি লাভের অধিকারকে কোন আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুন্ন করা যাবেনা। কোনো অঙ্গরাজ্য অইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তাছাড়া এই সংশোধনে আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারকেও স্বীকার করা হয়েছে।

এই সরকারকে অনেকের অভিমত হলো মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার

AMBITION Edition 2017

ভূমিকা যথাযথভাবে সম্পাদন করেছে এবং মার্কিন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **৬ x ৪ =২৪**

ক) ব্রিটিনে ডাইসি-কৃত 'আইনের অনুশাসন' ধারণাটির মূল্যায়ন করুন।

উত্তর ঃ- আইনি শাস্ত্র এবং শোষনতান্ত্রিক আইনের জগতে আইনের অনুশাসন সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। এবং প্রতিষ্ঠিত গতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার সাথে এই নীতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অবশ্য আইনের অনুশাসন ধারণাটি যে খুব একটা স্পষ্ট ধরাণা তা নয়। এই নীতিটির প্রারম্ভিক অর্থ হল শাষক এবং শাসিত উভয়েই একই আইনের আওতায় থাকবে এবং কারোর জন্যই আইনের বিশেষ সংস্তান থাকবে না। অনেকের মতে, অ্যারিস্টটলের লেখায় 'আইনের অনুশাসন কথাটির ইঙ্গিতপাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, কোন একজন ব্যক্তির চেয়ে আইনের শাসন অধিক কাম্য। মধ্যযুগে আইনের অনুশাসন বলতে বোঝাত পৃথিবী পাঁচ রকম আইনের দ্বারা শাষিত- মানবিক আইন ঈশ্বরিক আইন চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতেও আইনের অনুশাষন কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বহুপূর্বে পার্লামেন্টের সার্বভোমত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আইনের অনুশাসন সম্পর্কে পার্লামেন্টের সিদআদান্তই চরম বলে গণ্য হতে থাকে। লর্ড হেনরির আমলে আইনের শাষন ও পার্লামেন্টের সার্বভোমত্ব মোটামুটি ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যার প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ ঘটে ১৬৮৮ সালে অধিকারের বিল ঘোষণার মাধ্যমে। এই সমস্ত থেকে সামন্ত শ্রেণীর প্রাধান্য পরিবর্তে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এই সময় তেকে আইনের অনুশাসনের অর্থ দাঁড়ায় রাজশক্তি এবং রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা পার্লামেন্টে প্রণীত আইন বা প্রথাগত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও প্রথাগত আইনের পরিবর্তে পার্লামেন্টে প্রণিত আইনের প্রাধান্যই স্বীকৃত লাভ করেছে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বাদের ধ্যান-ধারণা ব্যাপকতা লাভ করলে এ.ভি. ডাইসি অনুশাষকে সুনির্দিষ্ট অর্থ দান করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের হোয়ারের মধ্যে এ.ভি. ডাইসির আইনের অনুশাসন ধারণাকে ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত An Introduetion to the Law of the Coustitution'' গ্রন্থে ডাইসি আইনের অনুশাসষনের দারনাকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন, তার অনুশাসনের ধারণাটি তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১। সাধারণ আইনের প্রাধান্য, (২) আইনের চোখে সমতা, (৩) জন সাধারণের অধিকার সাধারণ আদালত দ্বারা সংরক্ষিত।

প্রথমত, ঃ- ডাইসির মতে সুস্পষ্ট বাবে আইন ভঙ্গ না করলে এবং প্রচলিত সাদারণ আইন অনুসারে সাধারণ আদালত কর্তৃক আইন ভঙ্গের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হলে কোন ব্যক্তিকেশাস্তি দেওয়া যাবে না। কিংবা তাকে তার জীবন বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এত দ্বারা সাধারণ আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। সরকারের এমন কোন বিশেষ ক্ষমতা বা স্বৈরি শাসন কিংবা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই যার বলে বলীয়ান হয়ে সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। এক কথায় সাধারণ আইনই হল চরম ও চূড়ান্ত প্রাধান্যের অধিকারী। কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। আদালতে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকা বাঞ্ছণীয়।

দ্বিতীয় ঃ- ডাইসির ব্যাখ্যা অনুসারে আইনের দৃষ্টিতে সকলে, সমান, তার মতে, কোন ব্যক্তি আইনের উর্দ্ধে নয়। পদ মর্যাদা অথবা আহ্বাণ যাই হোক না কেন প্রত্যেকেই দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং দেশের সাধারণ বিচারালয়ের অধীনস্ত। (.....''No man is above the law but...here every Man, what over be his rank or condition is subject to the ordinary low of the realm and amenable to the just diction of the ordinary tribunal.'')

ডাইসির প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারী পদ মর্যাদা কিংবা সামাজিক পদ মর্যাদা বির্বিশেষে সকল নাগরিককে সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রণাধীক করা এবং একই ধরণের আদালত সকলে বিচার লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

এ দিক থেকে আইনের অনুশাসনের অর্থ করা হয়েছে যে, সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ নাগরিকদের মতোই একই আইন মেনে চলতে বাধ্য হয় এবং সাধারণ আদালতের নিকট দায়ি থাকতে হয়। ডাইসির এখানে ফ্রান্সের দেখিয়ে ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ফ্রান্সে যেখানে সরকারের সাথে সাধারণ নাগরিকের বিবাদ মীমাংসার জন্য পৃথক শাষনবিভাগীয় আইন ও শাষন বিভাগীয় আদালত আছে যেখানে ইংল্যাণ্ডের সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ আইনের এক্তিয়ার পরিব্যপ্ত।

তৃতীয়ঃ - যেসব দেশে লিখিত সংবিধান যেখানে সংবিধান দ্বারা নাগরিক অধিকার সমূহ স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ব্রিটেনে কোন লিখিত সংবিধান না থাকায় সংবিধান দ্বারা নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের কোন সুযোগ নেই। তাই যেখানে আদালতের উপর ভিত্তি করে নাগরিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাধারণ আইনের দ্বারাই সেগুলি সংরক্ষিত হয়। সেই কারণে বলা হয়েছে যে, ব্রিটেনে নাগরিক অধিকার কোন সাংবিধানিক ঘোষনা নয়। প্রথাগত আইন দ্বারা তা সংরক্ষিত। অন্যভাবে বলা যায় ইংল্যাণ্ডের নাগরিক অধিকার সমূহের উৎস

AMBITION
Edition 2017

সংবিধান নয় বরং সংবিধানের উৎস হল নাগরিক অধিকার সমূহ, অর্থাৎ এখানে সাধারণ আইনের সার্বভৌমত্বে বা প্রাধান্যকে আইনের অনুশাসন বলা হয় ।আইভর জেনিংস এরমতে, আইনের অনুশাষনের
প্রথমত, অর্থ হল মোটামুটি ভাবে সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট সাধারণ নিয়মাবলী দ্বারা বিভিন্ন প্রকার অপরাধ নির্ধারিত হবে।
দ্বিতীয় ঃ- এই সব সাধারণ নিয়মের বর্হিভূত অপরাধে ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।
তৃতীয় ঃ- শাস্তি দান সংক্রান্ত বিধিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে যাতে করে বিধি বর্হিভূত কোন কার্য অপরাধে বলে বিবেচিত না হয়।
চতুর্থ ঃ - কোন অপরাধ মূলক কাজের বিচার - সেই সময়কার। আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন াপরাধমূলক কার্যের বিচার পরবর্তী কোন এক সময়ে প্রণীত আইনের দ্বারা হতে পারে না।
সমালোচনা ঃ- আইনের অনুশাসন তত্ত্বে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডাইসির ব্যাখ্যা নিঃন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিশ্লেষন রূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তার এই ধারণা উনবিংশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী চিন্তাধারায় দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমানে নানা দিক থেকে ডাইসির প্রদত্ত আইনের অনুশাষন তত্ত্বটির সমালোচনা করা হয়।

ডাইসির প্রথমনীতিটিতে সাধারণ আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্য স্বীক্যত হয়েছে ? সাধারণ আইন বলতে তিনি প্রথাগত আইন ও পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের কথাই বলেছেন। নানা কারণে সমালোচিত হয়।
প্রথমত, চরম সংকটের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ধনতন্ত্রবাদ বর্তমানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করেছে এমনকি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদের তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি, স্বাতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের মতো বর্তমান শতাব্দির রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিশেহভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্রিটেনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি ফলে কেবলমাত্র পার্লামেন্টের পক্ষে এই সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় শাসন বিভাগের অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন আইনের অনুশাসন প্রথম এর নীতিটির মূলে কুঠারাঘাত করেছে।
দ্বিতীয়ত, ঃ- ডাইসির মতে সরকারের কোন প্রকার স্বৈরীক্ষতা, বিশেষ ক্ষমতা, কিংবা স্বেচ্ছাবীন ক্ষমতা থাকতে পারে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় ইংল্যাণ্ডেও শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শাষন বিভাগ বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেছে সুতরাং, বলা যেতে পারে, যে সরকারের ক্ষমতাকে ডাইসি যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে ছিলেন বর্তমানে তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
তৃতীয়ত ঃ- ব্রিটেনে সাধারণ আইন ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার আইনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সাধারণ আদালতের পরিবর্তে বিশেষ পরিবর্তে বিশেষ আদালতর বিশেষ আইনের সাহায্যে এই সব আইন ভঙ্গের বিচার হয়। ফলে ডাইসির নীতি বর্তমানে অকার্যকার হয়ে পড়েছে।
চতুর্থত ঃ মার্কসবাদীদের মতে সাধারণ আইনের উপর ভিত্তি করে ডাইসির প্রথম নীতিটি প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রতিটি দেশের আইন কানুন রাষ্ট্রপ্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই রতাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর আইনের প্রকৃতি নির্ভরশীল ব্রিটেনের মতো বৈষম্যমূলক সমাজে রাষ্ট্র যেহেতু প্রভুত্বকারী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার হিসাবে কাজ করে সেহেতু এরূপ আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের অর্থ হল বিশেষ শ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করা। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কোন স্বারআতই রক্ষিত হয় না। সুতরাং, এই তত্ত্বটি প্রচার করে ডাইসী কার্যর বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থকে দৃঢ়ড়াবে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া আইন ভঙ্গকারীর বিচারের দায়িত্ব সাধারণ আদালতের উপর অর্পণ করার কথা তিনি ঘোষনা করেছে। কিন্তু বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ন্যায় বিচার করতে অক্ষম ফলে আইনের অনুশাষনই কার্যত পরিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডাইসি প্রচারিত আইনের অনুশাসন এর দ্বিতীয় নীতিটি হল আইনের দৃষ্টিতে সমতা নানাভাবে এই নীতিটির সমালোচনা করা হয়।
প্রথমত ঃ- ব্রিটেনের সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক এর মধ্যে ক্ষতা গত দিক থেকে পার্থক্য করা হয়। একজন সাধারণ পুলিশ কর্মচারীর যা ক্ষমতা আছে, ব্রিটেনের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের তা নেই।
দ্বিতীয় ঃ- সরকারী কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা বিশেষ সুযোগ ভোগ করতে পারেন।
তৃতীয় ঃ- ব্রিটেনে অবস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রের কুটনৈতিক কর্মচারীগণ ব্রিটেনের সাদারণ আদালতের বিচার পদ্ধতির বাধ্য বাধকতার অধীন নয়।
চতুর্থ ঃ- ইংল্যাণ্ডে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধের বিচার সাধারণ আইনের মাধ্যমে সাধারণ আদালতে সম্পাদিত হয় না। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আদালতর সমূহ সরকারী ক্ষমতা অপব্যবহারের হাত থেকে নাগরিকদের যে ভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ডাইসীর বহুল প্রচারিত আইনের অনুশাসনের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি।
পঞ্চমত ঃ- প্রতিটি রাষ্ট্রের আইন যেহেতু সমস্ত প্রভুতকারী শ্রেণি এর ইচ্ছাপ্রকাশ সেহেতু ব্রিটেনের মতো বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। এরূপ আইন কখনই শ্রেণি স্বারআতের উর্দ্ধে উঠে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে না।

আইনের অনুশাষনের তৃতীয় নীতি হল নাগরিক অধিকার সমূহ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত

AMBITION
Edition 2017

হয়েছে। সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভাবেএ সত্য নয়। কারণ–
প্রথমত ঃ- ব্রিটেনে এমন কতকগুলি অধিকারের অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলি বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা উদ্ভত এবং সেই সব আইনের দ্বারা সংরক্ষিত। তাছাড়া অধিকারের বিল, মহাসনদ, হেবিয়াস কর্পাস প্রভৃতির কার্যকারিতা অনেকাংশে বিধিবদ্ধ আইন বা লিখিত দলিলের উপর নির্ভর করে।
দ্বিতীয় ঃ- ব্রিটেনের সংবিধানে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক নীতি আছে। যেগুলি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
তৃতীয় ঃ- প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অধিকার সমূহই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী ডাইসির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিধিবদ্ধ আইন করুক প্রদত্ত্ব অধিকার সমূহ যেমন পেনশন বীমা, অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদিরত অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করার দূরদৃষ্টি তিনি দেখাতে পারেন নি।
চতুর্থত ঃ- স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়, ব্রিটিশ শাষন ব্যবস্থার মূল নীতি হল পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা আইনের অনুশাসন নয় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চূড়ান্ত সার্বভৌমকর্তৃত্বের বলতে যে কোন সাধারণ আইন এমনকিপ্রথাগত আইনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। তা ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী শ্রেণির প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট; । জনগণের সার্বিক দাবী পূরণ করতে পারে না তাই ব্রিটিশ নাগরিকরা কিছু পরিমানে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারলেও সামাজিক অর্থনৈতিক অধিকার সমূহ একানে স্বীকৃতি লাভ করেনি। আর অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া অন্যান্য অধিকার বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে তাছাড়া পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সংকটের মূলে ব্রিটেনের বুর্জোয়া সরকার অনেক সময়ের জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সমূহকেও খর্ব করতে কুণ্ঠিত হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চলাকলীন রেগুলেশন ১৮ বি-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, আইনের অনুশাসন বলতে যদি সাধারণ আইনের প্রাধান্য আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ বোঝায় তাহলে এগুলি যথার্থ ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য জনগণের প্রাধান্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা সম্ভব নয়। কারণ এই সব রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আইনের প্রাধান্য-এর পরিবর্তে সংখ্যা গরিষ্ঠ, ধনিক, বণিক শ্রেণি কর্তৃক রচিত আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সংক্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থে আইনের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

খ) ব্রিটেনে লর্ডসভার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি কী কী ?

উত্তর ঃ- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ। তার মধ্যে যথা- লর্ডসভা ও কমন্সসভা। উভয় কক্ষই পার্লামেন্টের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। কমন্সসভা প্রথম কক্ষ হিসাবে এবং লর্ডসভা দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চকক্ষ হিসাবে পরিচিত। ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইন কার্যকর বা প্রণিত হবার পূর্বেই উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এবং প্রায় সমক্ষমতার অধিকারী ছিল। কমন্সসভা জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। কিন্তু অন্যদিকে, লর্ডসভা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কক্ষ নয়। এর বেশীর ভাগ সদস্যই অধিকার বলে সদস্য হিসাবে গণ্য হন। তাই লর্ডসভাকে অনেকেই অগণতান্ত্রিক কক্ষ বলে অভিহিত করেছে এবং কমন্সসভাকে ব্রিটেনের জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সভা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনত্ব এবং আভিজাত্যের দিক থেকে লর্ডসভা কমন্সসভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে বর্তমানে লর্ডসভা অপেক্ষা কমন্সভাকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়ে থাকে। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের মধ্যে সংবিধানিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নিম্নে আমরা উভয়কক্ষের পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি।
১। গঠনগত পার্থক্য ঃ- লর্ডসভার সদস্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা মনোনয়নের ভিত্তিতে সদস্যপদ লাভ করেন। তাই এই কক্ষটি অগণতান্ত্রিক প্রকৃতি বিশিষ্ট বলে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু কর্মসভার সদস্যগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা গঠিত।
২। সংখ্যাগত পার্থক্য ঃ- কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা অনেক বেশী। কমন্সভার সদস্য সংখ্যা হল ১৫৯ আর লর্ডসভার সদদস্য সংখ্যা হল প্রায় ১১০০। পার্লামেন্টের আইনের পরিবর্তন ব্যতীত কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা চলে না। কিন্তু লর্ডসভার সদস্য সংখ্যা যেকোন সময় বৃদ্ধি পেতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডেরা ছাড়াও রাজানুগ্রহে উপাধি বিতরণের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।
৩। কার্যকাল সংক্রান্ত পার্থক্য ঃ- লর্ডসভা হল পার্লামেন্টের স্থায়ী কক্ষ। কিন্তু কমন্সসভার সদস্যগণ প্রতি ৫ বছর অন্তর গঠিত হয়। প্রয়োজনীয় করার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমেই রাজা বা কমন্সসভাকে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু লর্ডসভার ক্ষেত্রে রাজা বা রাণীর এই ক্ষমতা নেই।
৪। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ- কেবলমাত্র সাধারণ নির্বাচনের পর কমন্সসভা সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত জন। মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের যেকোন কক্ষ থেকে নিযুক্ত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমন্সসভা থেকেই বেশীর ভাগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কাজেই বলা যায়, সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কমন্সসভার ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লর্ডসভার কোন ভুমিকা নেই।
৫। মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ- ব্রিটেনে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা তত্ত্বগত ভাবে পার্লামেন্টের কাছে

AMBITION
Edition 2017

দায়বদ্ধ হলেও প্রকৃত পক্ষে কেবল কমন্সসভা কাছে লর্ডসভা কাছে নয়। কারণ সরকারের কাজকর্মের জন্য সমালোচনা বা ভোটাভুটি সরকারের বিপক্ষে গেলেও তাকে পদত্যাগ করতে হয় না। কিন্তু কমন্সসভায় সরকারী কোন বিল বা প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয় এবং অনাস্থা প্রস্তাব কেবলমাত্র কমন্সসভাতেই উস্থাপিত হয়।

৬। বিতর্ক সভার গুরত্বগত পার্থক্য ঃ- পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই বিতর্ক চলার সুযোগ থাকলেও কমন্সসভাই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বিতর্ক মঞ্চ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ এক্ষেত্রে জনগণের কক্ষ হিসাবে কমন্সভার জনপ্রতিনিধিদের আলোচনা বিতর্ক প্রচার মাধ্যমগুলিতে এবং জনমনে যথেষ্ট আলোড়ন তোলে।

৭। সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ-

সরকারি ায়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লর্ডসভা অপেক্ষা কমন্সসভার শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষবাবে লক্ষণীয়। কমন্সভার অনুমোদন ছাড়া সরকার এক পয়সা ব্যয় করতে পারে না। আবার কমন্সসভা আইন প্রণয়ণ না করলে সরকার কোন নতুন কর ধার্য বা ঋণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। সর্বোপরি এসটিমেন্ট কমিটি পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি প্রভৃতির দ্বারা কমন্সসভা সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব বিষয়ে লর্ড সভার কোন ক্ষমতা নেই।

৮। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- আইন প্রনয়নের ৩ত্রে পূর্বে লর্ডসভা ও কমন্সসভা ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালে পার্লামেন্ট আইন প্রণিত হবার পর আনই প্রণয়নের ব্যাপারে কমন্সসভার আধিপত্য সুপ্রতিষ্টিত হয়েছে। সাধারণ বিল উভয় সভায় উত্থাপিত হতে পারে। কমন্সসভায় অনুমোদিত না হলে তা পাশ হতে পারে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে ছিল লর্ডসভার বিরোধীতা সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয়নি। যদি (ক) কমন্সভা পর পর দুটি অধিবেশনে বিলটি পাশ করে এবং (খ) প্রথম অধিবেশনে কমন্সসভার বিলটি দ্বিতীয় পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে কমন্সসভার বিলটির তৃতীয় পাঠের মধ্যে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে লর্ডসভা কেবলমাত্র বিলটিকে কিছুদিন আটকে রাখতে পারে এর বেশী ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনা।

৯। অর্থ বিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ - অর্থ বিলের ক্ষেত্রেও লর্ডসভা অপেক্ষা কমন্সভার প্রাধান্য প্রশ্বাতীত। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অর্থবিল কেবলমাত্র কমন্সভাতেই উত্থাপিত হতে পারে না। লর্ডসভায় উত্থাপন করা যায় না। আইন অনুসারে কমন্সসভা দ্বারা গৃহীত অর্থবিল লর্ডসভায় আপিল করার জন্য পাঠানো হয়। লর্ডসভা যদি একমাসের মধ্যে বিকটি পাশ না করে তাহলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ দ্বারা এই বিল পাশ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ লর্ডসভা কমন্সসভায় গৃহীত অর্থবিল সংশোধন বা বাতিল করতে পারে না। কেবলমাত্র একমাসের জন্য বিলটির আইনে পরিণত হবার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে।

১০। অভিযোগ প্রতিকারে কমন্সভার ভুমিকা ঃ- শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য লুইডেন, ডেনমার্ক, প্রভৃতি দেশের অম্বুটসম্যান এবং নিউজিল্যাণ্ডে পার্লামেন্টারী কমিশনার রয়েছে। ব্রিটিনেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সাল থেকে পার্লামেন্টারী কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমলাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ থাকলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষযে সম্পর্কে পার্লামেন্টের যেকোন সদস্যকে অবহিত করা প্রয়োজন। এরপর তিনি পার্লামেন্টারী কমিশনারের কাছে তিনি সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি পেশ করে এবং অভিযোগ অনুসন্ধানের পর অভিযুক্তের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নথিপত্র পেশের নির্দেশ পারেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত আমলা বা অভিযুক্ত সরকারী দপ্তর পার্লামেন্টারীক বিষয়টি সম্পর্কে রিপোর্ট কমন্সসভার নিকট পেশ করেম। কাজেই বলা যায়, জনঘনের অভিযোগের বিষযে লর্ডসভা অপেক্ষা কমন্সসভার ভুমিকা অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১১। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- একটি মাত্র ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। সেটি হল বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা। যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হল লর্ডসভা। এককথায় বলা যায়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে লর্ডসভা যে গুরুত্বপূর্ণ পালন করে কমন্সভা হাতে সে কারণে কোন ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। লর্ডসভার চ্যান্সেলর সর্বোচ্চ আপীল আদালতের দায়িত্বে থাকেন অবশ্য সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কাজ করার সময় লর্ড সভার সব সদস্যই সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে না। কেবলমাত্র আইন ও লর্ডসবার পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন। মস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার এখানে হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে নিম্নকক্ষ কমন্সসবা ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। একমাত্র বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন ৩ত্রেই লর্ডসবা কমন্সভার মর্যাদা উন্নত হতে পারে না। বরং লর্ডসভার অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল পরিপ্রেক্ষির সাথে তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অসামঞ্জস্যের দরুন বিভিন্ন সমাজে লর্ডসভার সাধনের নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে লর্ডসভার ক্ষমতা সংকুচিত করে আইন প্রণিত হয়েছে। তবে সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণির বিরোধিতার ফলে লর্ডসভার সাধনে সমস্ত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি ব্রিটেনের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটি প্রবাবশালী দলের মধ্যে সমশ্রেণী স্বার্থের সুদৃঢ় বন্ধন থাকায়

AMBITION
Edition 2017

পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পার্লামেন্ট ও সরকারী কার্যাদো পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে শ্রমিক দল ও লর্ডসভাকে নিজ কার্য পরিচালনার পথে ক্রমশ প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে না। তাই এখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় লর্ডসভা কিছুটা মর্যাদা নিয়েই টিকে রয়েছে।

গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'অধিকারের সনদ' বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ- **মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট কে নাগরিক অধিকার বলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন ঃ–**

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট হলো মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আদালত। একে মার্কিন জাতির সর্বোচ্চ আদালত বলা হয়। হাডসন (Hudson) বলেন "The supreme court of the United States is he only Federal Court set up by the constitution itself ... It is the highest court in the Nation".

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে "নাগরিক অধিকার সমূহের সংরক্ষক" বলা হয়। মূল সংবিধানে নাগরিক অধিকারের উল্লেখ ছিলনা, কিন্তু সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নাগরিকরা যে সকল অধিকার ভোগ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনাত, ধর্মের অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা ইত্যাদি।

মার্কিন নাগরিকদের ওইসব অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন সভার বা কেন্দ্রিয় বা রাজ্য সরকারের কোনো আদেশ বা নির্দেশকে নাগরিক অধিকার বিরোধী মনে করলে সুপ্রীম কোর্ট সেগুলিকে বাতিল করে দিতে পারে।

1895 সালে পোলক বনাম ফারমার্সলোন আন্ত ট্রাস্ট কোম্পানীর মামলায় আয়কর ধার্য করাকে সম্পত্তি শালিদের ওপর অত্যাচার বলে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে। দীর্ঘ কাল ধরে সুপ্রীমকোর্ট সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার বিরোধী অনেক রায় প্রদান করেছে।

নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আইন ও শাসন বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে অধিকার গুলি সংরক্ষক সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্ব। মার্কিন কংগ্রেসের কোন আইন বা শাসন বিভাগের কোনো সিদ্ধান্ত নাগরিকদের বিধিবদ্ধ অধিকারের বিরোধী হলে সুপ্রীম কোর্ট সংশ্লিষ্ট আইন বা সিদ্ধান্তকে বাতিল করে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

একথা ঠিক যে, নাগরিক অধিকার সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে 1936 সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট বিত্তবানদের সম্পত্তি গত অধিকার সরকারের নিয়ন্ত্রন থেকে রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মার্কিন সুপ্রীমকোর্ট এই সময় সাধারণ ও শ্রমজীবি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হলো শ্রমিকদের কাজের সময় সীমা বেঁধে দিলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে।

সুপ্রীম কোর্ট সরকারের স্বৈর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রনের হাত থেকে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তৎপর হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার জন্যই যে সরকার সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিক অধিকার সংকুচিত করতে পারেনি একথা অস্বীকার করা যায়না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের অধিকার ও মর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রাউন বনাম টোপেকার শিক্ষাপর্ষদ (1984) মামলায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়দের জন্য আলাদা বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা "আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার"-এর বিরোধী হবে।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলি Bill of Rights নামে পরিচিত। তাছাড়া শাসনতন্ত্রের অন্যান্য অংশও কিছু অধিকারের উল্লেখ আছে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা বা অব্যাহতি লাভের অধিকারকে কোন আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুন্ন করা যাবেনা। কোনো অঙ্গরাজ্য অইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তাছাড়া এই সংশোধনে আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারকেও স্বীকার করা হয়েছে।

এই সরকারকে অনেকের অভিমত হলো মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যথাযথভাবে সম্পাদন করেছে এবং মার্কিন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বহুদলীয় ব্যবস্থা। ফরাসীয় দলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থার উপযুক্ত উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের হাত ধরেই দল-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এবং জন্মলগ্ন থেকেই ফ্রান্সে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয়ের কথা হলা হয়।

AMBITION
Edition 2017

ফরাসীরা মানসিকভাবে বহুদলীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ঃ– ফরাসী বহুদলীয় ব্যবস্থার অন্যতম কারণ হিসাবে ফরাসী জাতির মানসিকতার কথা বলা হয়। ফরাসী জনগণের মানসিক গঠন এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেচে। ফরাসীরা হল স্বভাবসিদ্ধ জীবনধর্মী দার্শনিক। এদের অধিকাংশই হল ভাববাদী তাত্ত্বিক। এদের জীবনবোধ দার্শনিকসুলভ মনোভাবের বশবর্তী। এরা এক আদর্শ সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর থাকে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফরাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব কর্মপন্থার মানুষ নন। বাস্তবতার পরিবর্তে ফরাসীরা আদর্শগত চিন্তা-চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। ফরাসীরা প্রকৃতিগতভাবে মতান্ধ। পরিণামের কথা তারা চিন্তা করে না। নিজেদের আদর্শগত ভাবনা-চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা কাজ করে। নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্যের কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হয় না। তার ফলে ফরাসী জনগণের অসংখ্য আদর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে বহু ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এবং এই দল ও গোষ্ঠীগুলি কালক্রমে সম্মিলিত হয়ে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের জন্ম দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লাওয়েল (Lowell)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : "A Frenchman is inclined to pursue an ideal, striving to realise his conception of a perfect form of society, ... Such a tendency naturally gives rise to a number of groups, each with a separate ideal, and each unwilling to make the sacrifice that is necessary for a fusion into a great party".

রাজনীতিকে সংগ্রাম হিসাবে বিবেচনা ঃ– ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। সরকারী দল অন্যান্য দলগুলির প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিরোধী দলগুলিও ক্ষমতাসীন দলের কাছে ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করে না। এর মূলে আছে ফরাসী জনগণের আবেগপ্রবণতা। ফরাসীদের পছন্দ-অপছন্দের মাত্রার তারতম্য ব্যাপক বৈপরীত্যে ভরা। ফরাসী নাগরিকদের কাছে রাজনীতি এক ধরনের খেলা নয়, প্রকৃত সংগ্রাম স্বরূপ ("Politics is a battle rather than a game.")। এই কারণের জন্যও ফ্রান্সে বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

জনপ্রতিনিধিকে দূত হিসাবে ব্যবহার ঃ– ফরাসীরা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দূত হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। ফরাসী জনগণ মনে করে যে জনপ্রতিনিধিরা তাদের দাবিদাওয়াগুলি আদায় করার ব্যাপারে সরকারের উপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে যাবে। সুতরাং জনপ্রতিনিধিকে জনগণের পছন্দ পূরণের উপায় বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা মানসিকতা বা আচরণ ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারে সাহায্য করেছে।

প্রচলিত সংসদীয় রীতিনীতি ঃ– ফরাসী বহুদলীয় ব্যবস্থার পিছনে অন্যতম কারণ হিসাবে ফ্রান্সের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার কতকগুলি রীতিনীতির কথা বলা হয়। এই সমস্ত রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নির্বাচনে দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতির প্রয়োগ, বাস্তবে পার্লামেন্ট বাতিলের সম্ভবনা না থাকা, সংসদীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতি প্রভৃতি। তা ছাড়া সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির কথাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থার পিছনে ভৌগলিক কারণের উপস্থিতির কথাও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) তাঁর *Major Modern Political Systems* গ্রন্থে বলেছেন : "... the multiplicity of party system coupled with the diversity of organisation, .. also derives source from the geographical composition of the country." ব্লনডেল ও গডফ্রে (Jcan Blondel and Godfrey, Jr.)-কে অনুসরণ করে তিনি আরও বলেছেন : "Broadly speaking, the northern half is more right-wing than the southern-half, the West and East are particularly christian, traditional and indined tovote conservative, while the centre and South-West are both or....."

AMBITION
Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

সহায়ক পাঠক্রম-৩ (তৃতীয় পত্র)

Subsidiary-3 (Third Paper)

(Goverment and politics in India)

AMBITION

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **২০ x ২ =৪০**

খ) ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকার ব্যাখ্যা করুন ঃ–

উত্তর ঃ- **সাম্যের অধিকার (Right to Equality)**

সাম্যের ধারণা ঃ– ব্যাপক অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে সকল রকম সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি। বস্তুত সাম্য হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক আদর্শ। ফরাসী জাতীয় সংসদের ১৭৮৯ সালের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা অনুসারে 'অধিকার সম্পর্কে সকলেই পরস্পরের সমান'। ভারতের সংবিধানে গণতন্ত্রের একটি আদর্শ হিসাবে সাম্যের ধারণাটিকে স্বীকার করা হয়েছে।

উৎস ঃ– ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা প্রতিষ্ঠার সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার এই ঘোষণাকো বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানে ১৪ থেকে ১৮ — এই পাঁচটি ধারায় সাম্যের অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাম্যের অধিকার সমপর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা মৌলিক উদারপন্থী গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকদের পথ অনুসরণ করেছেন। তা ছাড়া তাঁরা ব্রিটেনের প্রথাগত আইন, মার্কিন শাসনতন্ত্রের চুতর্দশ সংশোধন, ডাইসির আইনের অনুশাসনের তত্ত্ব ও গান্ধীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' ও 'আইনের সমান সংরক্ষণ' ঃ– সংবিধানের ১৪ ধারা অনুসারে, "ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' অথবা 'আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার' অস্বীকার করতে পারবে না"। এই ধারাটিতে দু'ধরনের সাম্যের কথা বলা হয়েছে :(১) 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' (equality before the law) এবং (২) 'আইনের সমান সংরক্ষণ' (equal protection of the laws)। বলা হয়েছে যে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দুটি অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না। অধিকার দুটির প্রথমটি ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন থেকে এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুব্বারাও-এর মতানুসারে প্রথমটি নেতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি ইতিবাচক।

প্রথমটিতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টিতে আইনের সমান আচরণের কথা বলা হয়েছে।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' ঃ– 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'–এই ধারণা ডাইসি(Dicey)-র আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতির অনুসরণে রচিত। ডাইসির মতানুসারে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে বোঝায় যে মর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে কোনও ব্যক্তিই দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকল ব্যক্তিই, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই, দেশের সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সাধারণ আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। প্রত্যের ব্যক্তি নিজের সকল কাজের জন্য আইনের কাছে সমানভাবে দায়িত্বশীল। কোন ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবী করতে পারবে না।

Edition 2017

সংবিধানে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে।

(১) রাষ্ট্রপতি বা কোন রাজ্যপাল তাঁদের পদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন না। পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা এবং তাঁদের গ্রেপ্তার বা আটক করা যাবে না। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যাবে। কিন্তু মামলা দায়ের করার আগে দু'মাসের লিখিত নোটিশ দিতে হবে (৩৬১ ধারা)

(২) কোন সরকারী কর্মচারী কর্তব্য পালনের সময় কোন ফৌজদারী অপরাধ করলেও রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না (ভারতের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৯৭ ধারা)

(৩) বিদেশী শাসক এবং রাষ্ট্রদূতগণ ভারতীয় আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন নন। আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুসারে এই সৌজন্যমূলক ব্যতিক্রম সকল সভ্য দেশেই মেনে চলা হয়।

(৪) কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসন-বিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা হয়। উদাহরণ হিসাবে ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প আদালতের কথা বলা যায়। আবার বিশেষ ধরণের গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য 'বিশেষ আদালত' গঠন করা যায়।

(৫) যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা ভারতের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন না এবং অন্যান্য বন্দীদের মত সুযোগ-সুবিধাও পান না।

আইনের সমান সংরক্ষণের অধিকার ঃ– আইনের সমান সংরক্ষণের অধইকার হল একাধারে একটি অধিকার এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন থেকে এটি গৃহীত। এই অধিকারের অর্থ হল সমান অবস্থার এবং সমান পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য একই আইন থাকবে এবং তা সমান আচরণ করবে (Similar treatment under similar circumstances)। অধ্যাপক জেনিংস (Prof. Ivor Jennings) বলেছেন : 'সমপর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য আইন হবে একই প্রকার এবং একইভাবে প্রযুক্ত হবে। একই অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্র কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। সুপ্রীমকোর্ট ১৯৫০ সালে সতীশচন্দ্র বনাম ভারত সরকার মামলায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছে।

তবে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভক্ত করে এবং আইনের উদ্দেশ শ্রেণীবিভক্ত করে এবং আইনে র উদ্দেশ্যের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবেদমূলক আইন প্রয়োগ করতে পারে। অবস্থা ও পর্যায়ের বিভিন্নতা থাকলেই আইনও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন, রাষ্ট্র বিভিন্ন আয়ের ব্যক্তিদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে আয়কর আদায় করতে পারে। তবে আনোয়ার আলি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে (১) শ্রেণীবিভাগটি সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হবে এবং (২) শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে আইনের উদ্দেশ্যের যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। ১৪ ধারায় অধিকারটি পুরোপুরি আইনগত। এবং এই ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়।

বৈষম্যমূলক আচরণ ঃ- সংবিধানের পনের ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান বা স্ত্রী-পুরুষভেদে বা তাদের কোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না [১৫(১) ধারা]। আবার কেবলমাত্র উল্লিখিত কারণগুলির বা তাদের কোন একটির জন্য দোকান, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোরাঁ, হোটের ও প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জৎসর্গীকৃত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার পথ ও সমাগম স্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বা অসামর্থ আরোপ করা যাবে না [১৫(২) ধারা]।

তবে রাষ্ট্র স্ত্রীলোক ও শিশু এবং অনুন্নত শ্রেণী, তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিসেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে [১৫(৩) ও (৪) ধারা]। এই বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুগামী।

সরকারী চাকরিতে সমানাধিকার ঃ- সংবিধানের ১৬(১) ধারায় সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। কোন নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মূলবংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে-কোন একটি কারণের জন্য সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে না [১৬(২) ধারা]। নিয়োগ ছাড়া বেতন, পদোন্নতি, ছুটি পেনসন প্রভৃতি চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও এই নিয়ম কার্যকরী হবে **[দক্ষিণ রেলওয়ে বনাম রঙ্গচারী (১৯৬১) ধারা]**।

ব্যতিক্রম ঃ– এই সমানাধিকারেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে। (১) পার্লামেন্ট আইন করে কোন অঙ্গরাজ্যের বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অধীন চাকতিরে নিয়োগর ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে [১৬(৩) ধারা]। (২) সরকার প্রয়োজন মনে করলে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরীকদের জন্য কিছু সরকারী চাকরি বা পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে [১৬(৪) ধারা]। (৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরি ঐ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে [১৬(৫) ধারা]। (৪) প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে অগ্রাধিকার দিতে পারে (৩৩০ ধারা)। সংবিধানের ১৬ ধারায় ধর্মনিরপেক্ষ কেবল সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে ১৫(৩) ও (৪) এবং ১৬(৪) ধারায় যে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তাকে সংরক্ষণমূলক বিভেদ-ব্যবস্থা (protective discrimination) বলা হয়। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে 'মণ্ডল কমিশন' সম্পর্কিত মামলার রায়দান প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট এ ধরণের সংরক্ষণ ব্যবস্থার যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়গত ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অধিকার ঃ– অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজজীবনের এক অভিশাপ। সংবিধানের ১৭ ধারায় এর বিলোপ সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর যে-কোন রকম আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। অস্পৃশ্যতার দরুণ কোন নাগরিকের উপর কোনরকম অক্ষমতা আরোপ আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এই

AMBITION
Edition 2017

অধিকারের উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য সমমর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন (The Untouchability Of-fence Act, 1955) পাস করেছে। তারপর আইনটির কিছু সংশোধন করা হয়। এই আইনটির বর্তমান নাম হল 'Protection of Civil Rights Act'.

খেতাবের বিলুপ্তি ঃ– সমমর্যাদা ও বিশেষ পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদানের ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক গুণের পরিচায়ক নয় — এমন কোন খেতাব বা উপাধি রাষ্ট্র প্রদান করতে পারবে না [১৮(১) ধারা]। কোন ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(২) ধারা]। ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত বিদেশীগণও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া উপঢৌকন, বেতন বা পদ গ্রহণ করতে পারবেন না [১৮(৩) ধারা]। সরকারী খেতাব জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম শ্রেমীবৈষম্যের সৃষ্টি করে। তাই খেতাব অবসানের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মানিত করার জন্য ভারত সরকার ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি সম্মান বিতরণের ব্যবস্থা চালু করে। জনতা সরকার ১৯৭৭ সালে এই ব্যবস্থা রদ করে। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ক্ষমতায় এসে উপাধি দানের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেছে। তা ছাড়া ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জুন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে ভারতের কৃতী সন্তানদের সম্মানিত করার জন্য প্রদত্ত ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি সম্মানগুলি খেতাবের পর্যায়ভুক্ত নয়। টি. কে. টোপ (T. K. Tope) মন্তব্য করেছেন : "Bharat Ratna, Padma Bhusana and Padmashree are awards, They are not titles." এগুলি পুরস্কার মাত্র। আগেকার দিনের স্যার, রায়বাহাদুর ইত্যাদি খেতাবের সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। সমাজতান্ত্রিক পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নেও 'লেলিন পুরস্কার' দেওয়া হত।

মূল্যায়ন (Evaluation) ঃ– ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

(১) এই পর্যায়ের অধিকারগুলির প্রকৃতি মূলতঃ সামাজিক বা রাজনীতিক। ভারতীয় সমাজ হল ধনবৈষম্যমূলক। এই অর্থনৈতিক অসাম্যের উপস্থিতিতে উপরিউক্ত সামাজিক ও রাজনীতিক সাম্যের সার্থক প্রয়োগের সুযোগ কম। কারণ অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনীতিক সাম্য মূলহীন। সাম্যের আদর্শকে ভারতে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে ধনবৈষম্যকে হ্রাস করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) অত্যাধিক ব্যতিক্রমের উল্লেখ সাম্যের অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে।

(৩) রাজ্য সরকারের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত সাম্যের আদর্শের বিরোধী।

(৪) যুক্তিসঙ্গত পৃথকীকরণের ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর যথার্থতা বিচারের ব্যাপারে আদালতের কোন এক্তিয়ার নেই।

(৫) সংবিধানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের কোন সংজ্ঞা নেই এ ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষমতা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হতে পারে।

(৬) অনেকের মতে সাধারণতন্ত্র দিবসে খেতাব বিতরণ সাম্য বিরোধী।

(৭) তপসিলী সম্প্রদায়ারে স্বার্থে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা জাতীয় সংহতির বিরোধী।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

ঘ) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও এক্তিয়ার আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের গঠন সম্পর্কে সংবিদানে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মূল সংবিধানে (১২৪নং ধারাতে) বলা হয়েছে, একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭জন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট গঠিত হবে। পরে বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাদারন বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে, বর্তমানে মোট বিচারপতির সংখ্যা ৩৬ করা হয়। অবশ্য সংবিধানে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হতে গেলে তাকে অবশ্য (ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (খ) একাস্ক্রিমে এক বা একাধিক হাইকোর্ট বিচারপতি হিসেব কর্মরত বিচারপতি হিসাবে কিংবা ১০ বছর এ্যাডভোকেট হিসাবে কর্মরত থাকতে হবে। (গ) রাষ্ট্রপতির মতে, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশ্নে সংবিধানে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং অন্যান্য সাধারন বিচারপতিদের নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে অবশ্যই এবং প্রয়োজনে সুপ্রীমকোর্টের সাধারন বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সাতে পরামর্শ করবেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরামর্শগ্রহণের কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এক্ষেত্রে প্রথা হল (১) বিচারপতিদের মধ্যে অন্তত একজন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং (২) প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতি প্রবীনতার নীতিকে অনুসরণ

AMBITION
Edition 2017

করবেন। সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা হয়েছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি যেহেতু জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষবাবে নির্বাচিত হননা, সেই কারণে তার কাজকর্মের জন্য তিনি জনগণের নিকটদায়ী থাকেন না। এমনকি রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক প্রধান রাজ্যপালের যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে সে দরনের কোন ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির কাছে নেই।

অন্যদিকে যাঁরা রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলে মনে করেন, তাদের মতে রাষ্ট্রপতি হলেন শাসন বিভাগীয় প্রধান এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং প্রশাসনের উচ্পদস্থ কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন। কাজেই নিয়োগকর্তা হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৭৫(১) নং ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির অধনস্থ কর্মচারীমাত্র। রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রী পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত জানতে আগ্রহী হন সে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তা জানাতে বাধ্য থাকেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারী করার হাতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন এবং এজন্য মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কোন দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনের ক্ষেত্রে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। উপরোক্ত দুটি মত এবং রাষ্ট্রপতির সামগ্রিক কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে একথা বলা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণির মত পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান নন। আবার মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত অতিক্ষমতা বান রাষ্ট্রপতিও নন। তবে সমাজিক বিবেচনায় ভারতীয় রাজনীতির বাস্তব পটভূমিকায় একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন মূলত নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান সেই কারনেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার সংস্থান রাখা হয়নি। এবং জনগণের কাছে শাসন ব্যাপারে দায়বদ্ধ রাখা হয়নি।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **১২ x ৩ =৩৬**

খ) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য বিশ্লেষন করুন।

উঃ— মার্কিন সংবিধানকে অনুসরণ করে প্রতিটি লিখিত সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনার সংযোজন বর্তমানে একটি রীতিতে পরিনত হয়েছে।সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন ,একটি ঐতিহাসিক দলিল।আর প্রস্তাবনা হল এই সংবিদানের ভূমিকা যা মুখবন্ধ।পুস্তকের ভূমিকার ন্যায় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে সংবিধানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং নীতিসমুহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান করা হয়।এ প্রসঙ্গে বিচারপতি সুব্বব্ববা রাও মন্তব্য করেন যে একটি আইনের প্রস্তাবনা তাঁর মূল উদ্দেশ্য গুলিকে প্রকাশ করে।

প্রত্যেক দেশের সংবিধানের একটি মতাদর্শগত ভিত্তি থাকে।নির্দিষ্ট কতগুলি আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে সংবিধান গড়ে ওঠে।আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যানদারনার ভিত্তিতে সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি গটিত হয়।একেই বলে সংবিদানের দর্শন।প্রস্তাবনার মধ্যেই সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।প্রস্তাবনা থেকে সংবিধানের আদর্শগত ভিত্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি জানা যায় এবং সরকারী কাঠামোর ধারনা,সংবিধানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়।

সাধারণ ভাবে প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বলে বিবেচিত হলেও তা কোনভাবেই কার্যকরী অংশের অন্তর্ভূক্ত নয়.এই কারনে প্রস্তাবনার আইনগত গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়।কিন্তু ভারতীয় সুপ্রীমকোর্ট বিভিন্ন মামলার রায়দান কালে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে,সংবিধানের মূল অংশের সাথে প্রস্তাবনার বিরোধ বাধলে আদালত সংবিধানের মূল অংশকেই আইনানুসারে গ্রহন করবেন,প্রস্তাবনাকে নয়।কাজেই সংবিধানের মূল অংশই আইনানুসারে স্বীকৃত এবং বলবৎ যোগ্য।তাছাড়া প্রস্তাবনাকে সরকার ও তার বিভাগ সমূহের মূল ক্ষমতার উৎস হিসাবেও বিবেচনা করা যায় না।এ.কে.গোপালন মামলায় সুপ্রীমকোর্ট অনুরুপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তবে প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভূক্ত না হলেও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় সংবিধানের শুরুতেও একটি প্রস্তাবনা যুক্ত হয়েছে এবং তা সংবিধানের মুখবন্ধের দায়িত্ব পালন করেছে।ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাগন স্বাধীনতা আন্দোলনকালে যে সামাজিক ,অর্থনৈতিক ও রাজৈনতিক আশা-আকাক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে প্রস্তাবনায়।এই প্রস্তাবনার নৈতিক প্রভাব অপরিসীম। সংবিধানের উৎস,লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,আদর্শগত ভিত্তি প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গের কাছে প্রস্তাবনা একটি পথনির্দেশিকা স্বরুপ।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্যকে তিনটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারেঃ———

(প্রথমত)ঃ০০০ সংবিধানের কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট অংশের অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া যায়.এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকার (১৯৫২),পাঞ্জাব রাজ্য বনাম আজয়ের সিং(১৯৫৩),রুচুনি বনাম কেরালা(১৯৬০),প্রভৃতি মামলার রায় উল্লেখ করা যায়।অনুরুপ ভাবে,মামলায়(১৯৬১),সুপ্রীমকোর্ট রায়দানের সময় মন্তব্য করেন যে,কোনও আইনের অর্থ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তা নিবারন করা যেতে পারে।অবশ্য সংবিধানের কার্যকরী অংশ সুস্পষ্ট থাকলে প্রস্তাবনার

AMBITION
Edition 2017

সাহায্য গ্রহন করার কোনও প্রয়োজন থাকে না।
(দ্বিতীয়ত)ঃ০০০ প্রস্তাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল ,এটি সংবিধান প্রণেতাগন তাদের দৃঢ় দৃষ্টি ভঙ্গী অনুযায়ী সংবিধান রচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরনে সচেষ্ট ছিলেন।এমনকি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সংবিধান ———- ।
(তৃতীয়ত)ঃ০০০ প্রস্তাবনা হল ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি ।এর রচয়িতাগন রচনা কালে যেসব সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন প্রস্তাবনার মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।প্রস্তাবনার মধ্যে গন-সার্বভৌমিকতা,রাষ্ট্রীয়–সার্বভৌমিকতা ,গনতন্ত্র,ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবদর্শনকেই শুধুমাত্র গ্রহন করা হয়নি ,সেই সঙ্গে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার,চিন্তা,মতামত,বিশ্বাস,ধর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা,সাম্য ভাতৃত্ববোধ,জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সংকল্পও ঘোষিত হয়েছে।এই ভাবে প্রস্তাবনা ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিকে চিহ্নিত করেছে।
প্রস্তাবনার এইসব গুরুত্বের কারনে পন্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব মন্তব্য করেছিলেন যে,প্রস্তাবনাই হোল সংবিধানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ।এটি হল সংবিধানের প্রান,সংবিধানের মর্মবস্তু উপলব্ধি করার চাবিকাঠি।এটি হল সংবিধান সন্নিবিষ্ঠ একটি মহামূল্যবান রত্ন।অবশ্য ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন - এর মতে ভঅরতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা হল নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প মাত্র।কিন্তু সংকল্প গ্রহন এবং তা কার্যকরণ এক কথা নয়।ভারতে কার্যক্ষেত্রে সংবিধান ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার মৌলিক আইনে পরিণত হয়েছে।ফলে সংবিধান বা তার প্রস্তাবনায় ঘোষিত সংকল্প ,সংকল্পই থেকে গেছে।সুতরাং একথা বলা যায় যে,কোন দেধের সংবিধান বা তার প্রস্তানায় কি বলা হল সেটা বড় কথা নয়,বড় কথা হল সংবিধানের শ্রেণী চরিত্র। আর এই শ্রেণীচরিত্রের মানদন্ডেই সংবিধান বা তার প্রস্তাবনার বিচার - বিশ্লেষন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) ভারতের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উঃ— রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হিসাবে ভারতীয় সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানের অনুসরনে ভারতে ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভম্বের এই সংবিধান গনপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী থেকে কার্যকারী হয়।মূলসংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ,অসংখ্য উপধারা ও ৪টি তলিকা ছিল।পরবর্তীকালে নানা সংশোধন,সংযোজন,পরিবর্ধন ও বাতিলীকরনের পরে এই সংবিধান এই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকৃতিবিশিষ্টই রয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে প্রনেতাগন যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্বেও সংবিধানকে মার্কিনযুক্তরাষ্টের ন্যায় অধিক মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয় করার পক্ষপাতি ছিলেন না।বরং সংবিধানকে গতিশীল করার জন্য আগ্রহী ছিলেন।***M .V .Pylee*** এর মতে *পরিবর্তিত চাহিদা ও পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে সংবিধানের গতিশীল হওয়া প্রয়োজন।সেই কারনে সংবিধানকে কিছুটা সুপরিবর্তনীয় গড়ে তোলা হয়েছে* ।

ভারতীয় সংবিধান সং শোধন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ৩টি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথমত ঃ— ভারতীয় সংবিধানে এমন কতগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলি সাধারন আইন পাশের পদ্ধতিতে অর্থাৎ পার্লামেন্টেটর সাধারন সব বিষয়গুলি হল ———

(১)নতুন রাজ্যের সৃষ্টি।
(২)রাজ্যগুলির পুনর্গঠন।
(৩)রাজ্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন বা বিলোপ।
(৪)নাগরিকত্ব বর্জন বা বিলুপ্তি ইত্যাদি।

সংবিধান সংশোধনের এই পদ্ধতিটি সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের আদর্শকে প্রতিফলিত করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ—ভারতীয় সংবিধানে এমন কতগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।এই সমস্ত বিষয়ে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পার্লামেন্টেটর যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হওয়ার পর পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের ২/৩ অংশ কর্তৃক সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।পরবর্তীপর্যায়ে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে সংবিধান সংশোধন করাযায়।

(ক)কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টটন।
(খ)সুপ্রীম ও হাইকোর্টের এক্তিয়ার সংক্রান্ত বিষয়.
(গ)রাষ্ট্রপতি নির্বাচন,ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলি এরুপ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধিত হয়।সংশোধনের এই পদ্ধতিটি অনেকাংশ জটিল হওয়ার জন্য এক্ষেত্রে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত ঃ—সংবিধানে এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলিকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় পদ্ধতির সমন্বয় লক্ষ্য করাযায়।এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করার জন্য পার্লামেন্টেটর উভয় কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের

AMBITION
Edition 2017

অধিকাংশ কর্তৃক এবংভোটপ্রদানকারী সদস্যদের ২/৩ অংশের দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন,এরপর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে সংবিধান সংশোধন করাযায় ।

ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতিবিচার করলে দেখা যায় যে এই সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় নীতির মধ্যে ভারসাম্য বিধান করেছে ।অনেকেই সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে ভারতে ভারসাম্য রক্ষার নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন ।বিভিন্ন স্বার্থ ও সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ কোনো নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে এরা মনে করেন ।অবশ্য সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক লক্ষ্য করাযায় ।সমালোচকগন মনে করেন যে ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।রাজ্য বিধানপরিষদের প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তি ,সংবিধান সংশোধনীয় বিল উত্থাপন ,রাজ্য গঠন ও নাম সীমানা পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে পার্লামেন্টের সীমিত ক্ষমতাকে ঘোষনা করেছে ।১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় বলা হয়েছে যে,সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে খর্ব করে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করতে পারে না ।[Parliament will have no power to amanol any prorision of the constitution.So as to takeaway or .....rights.]প্রকৃতপক্ষে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে বিচারবিভাগীয় রায় সুস্পষ্ট নয় । এক্ষেত্রে রাজনীতির বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে ।এছাড়া রাজ্যপুনর্গঠনের বিষয়ে পার্লামেন্টট কর্তৃক সংবিধান সংশোধন একক ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিরোধী বলা যায় ।

ঘ)ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য আলোচনা করুন ।

উত্তর ঃ- ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি কাম্য অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানে কাজ পাওয়ার অধিকার, বার্ধক্য, অক্ষমতা বা পীড়িত অবস্থায় সরকারী ভাতা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি উল্লেখিত আছে — যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ– বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশমূলক নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

(১) নীতিগুলি আদালতে অবলবৎযোগ্য। তাই এগুলিকে সংবিধানের অঙ্গশোভা বা সদিচ্ছার ঘোষণা বলা যেতে পারে। এগুলি তাত্ত্বিক ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কে. টি. শাহ পরিহাস ছলে মন্তব্য করেছেন ঃ "These principles are like a cheque on a bank payable when able-only when the resources of the bank permit."

(২) নীতিগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

(৩) নীতিগুলি নাগরিকদের জন্য কোন অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি।

(৪) জেনিংসের মতানুসারে, এই ধরণের নীতি লিখিত সংবিধানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৫) নীতিগুলি সংখ্যায় অত্যাধিক ও অস্পষ্ট বলে সেগুলি মেনে চলা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় না। নীতিগুলি কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশ বিশেষ। এ ধরণের নির্দেশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধস্তনকে দিতে পারে। তাই এরকম নির্দেশ স্বাধীন দেশের জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারের মর্যাদার বিরোধী।

(৬) অনেকে নীতিগুলিকে প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যের অভিযোগও তোলেন।

সমালোচনার জবাব ও তাৎপর্য ঃ– নির্দেশমূলক নীতিগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে বহু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

সংবিধান রচনার সময়কার দেশের অবস্থা, নীতিগুলির প্রতি আদালতের এবং সরকারে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির মাধ্যমে উপরিউক্ত সমালোচনার সঠিক জবাব দেওয়া যায় এবং নীতিগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

ক) এই সংবিধান রচনার প্রাক্কালে সমকালীন ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঠিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

(১) দেশবাসীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সংবিধান প্রণেতাদের সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু তৎকালীন আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অর্থনৈতিক অধিকারগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার সাধ্য সরকারের ছিল না। তৎকালীন অবস্থাই এই নীতিগুলিকে অসংরক্ষিত অধিকারে পরিণত করতে বাধ্য করেছে।

(২) সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারের কোন উল্লেখ নেই। নির্দেশমূলক নীতিগুলি এই অপূর্ণতা দূর করেছে।

(৩) নির্দেশমূলক নীতিগুলি শাসক সম্প্রদায়কে সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা যে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ তার নৈতিক নিশানা হিসাবে কতকগুলি নীতি ও আদর্শ সংবিধানে সংযুক্ত আছে।

(৪) অধ্যাপক হোয়ার-এর মতে নীতিগুলির মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনার ধারা অনুযায়ী ন্যায়, স্বাধীনতা,

AMBITION
Edition 2017

সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ঘোষিত হয়েছে। এই আদর্শগুলি নাগরিকদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।

(৫) নীতিগুলি জনপ্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার মর্যাদার পরিপন্থী নয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। সেই সংবিধানের মধ্যেই নীতিগুলি সন্নিবিষ্ট আছে।

(৬) ভারতের ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা এবং বিচিত্র ও জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যার দিক থেকে নীতিগুলিকে অত্যন্ত বেশী বলা যায় না।

(৭) সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতিগুলির উল্লেখ জনমনে আশা-আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত করেছে। নাগরিকদের অধিকারবোধ তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যথেষ্ট ব্যাপক ও উদার হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে আদালতও নীতিগুলির প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাব গ্রহণ করেছে। তার ফলে নীতিগুলির মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১) নির্দেশমূলক নীতির বিরোধী বলে আদালত কোন আইনকে বাতিল করতে পারে না। কিন্তু বহু আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে াদালত নীতিগুলির সাহায্য নিয়েছে। যেমন, কোন আইন ১৯ ধারায় স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের উপর অন্যায় বাধার সৃষ্টি করেছে বলে আপত্তি করা হলে, আদালত সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করবে, যদি সংশ্লিষ্ট আইন নির্দেশমূলক নীতির ভিত্তিতে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত হয়ে থাকে। কারণ, সংবিধানে যা রাষ্ট্রের করণীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অযৌক্তিক কলা যায় না। (বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর প্রসাদ, ১৯৫২)।

(২) আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৪৭ ও ৪৮ ধারায় উল্লিখিত নির্দেশের ভিত্তিতে ১৯(১) (ছ) ধারায় বর্ণিত বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা যায় (বুধু বনাম মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, ১৯৫২)।

(৩) বিচারপতি সপ্রু-র মতে, যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আলোচনার সময় নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে উল্লিখিত ৩৮ ও ৩৯ ধারায় বিষয় বিবেচনা করা দরকার (রামেশ্বর প্রসাদ বনাম জেলা ম্যাজিস্টেট, ১৯৫৪)।

(গ) নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য নীতিগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(১) নীতিগুলি দেশের শাসন বিষয়ে মৌলিক নীতি হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে দলীয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করে তারা জনমতের ভয়ে এবং পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় নীতিগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

(২) নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে একটি সরকারের দক্ষতা ও সাফল্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায়। নীতিগুলিকে কার্যকর করা বা না করার উপর একটি সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল।

(৩) নীতিগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নীতিগুলির সফল রূপায়ণ ছাড়া জনগণের কল্যাণ সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং জনকল্যাণের জন্যই নীতিগুলিকে মান্য না করে উপায় নেই।

(৪) নীতিগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলি যে অবহিত তার বহু প্রমাণ আছে। সরকার বিভিন্ন মাধ্যমে নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন বা করছেন। যেমন, ৩৯(খ) ধারা অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী অধিগ্রহণ, ৪০ ধারা অনুসারে গ্রামপঞ্চায়েত এবং সমাজ-উন্নয়ণ পরিকল্পনা, ৪১ ধারা অনুসারে কর্মচারীদের প্রভিডেন্ডফান্ড, বীমা ওমজুরী বোর্ডের ব্যবস্থা এবং কোন কোন রাজ্যে বেকার ভাতার ব্যবস্থা, ৪৪ ধারা অনুসারে হিন্দু বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন, ৪৫ ধারা অনুসারে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, ৫০ ধারা অনুসারে শাসন-বিভাগ থেকে বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা এবং দরিদ্রদের জন্য আইনগত সাহায্যের ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক সরকারী কর্মসূচী নীতিগুলির তাৎপর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

(৫) সংবিধানের ৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত এই নির্দেশমূলক নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে এমনকি মৌলিক অধিকারের বাধাকে পর্যন্ত অপসারিত করে একাধিকবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে সংবিধানের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তদশ, পঁচিশতম এবং বিয়াল্লিশতম সংশোধনী আইন উল্লেখযোগ্য। এগুলির মাধ্যমে নীতিগুলির রূপায়নের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়।

(৬) গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকার নীতিগুলিকে অনুসরণ করে। কৃষি, কুটির শিল্প, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বার্থে সরকার নির্দেশমূলক নীতি-নির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হয়।

(ঘ) নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বিশ্বমানবিকতার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ ধারায় উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ

AMBITION
Edition 2017

প্রকাশ পেয়েছে।

আইনগত সমর্থনের অভাবের জন্য নীতিগুলি এখনও যে দুর্বল তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নীতিগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই নীতিগুলি ভারতে সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক এবং প্রগতিশীলতার প্রতীক। ভারতের মত উন্নতশীল দেশের ক্ষেত্রে নীতিগুলি প্রগতির পথে নিশানাস্বরূপ। পণ্ডিত নেহেরুর মতানুসারে, নির্দেশমূলক নীতি মৌলিক অধিকার অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলি তাদের তারতম্য সত্ত্বেও উভয়েই উভয়ের অনুপূরক। মৌলিক অধিকারকে বাদ দিয়ে রাজনীতিক গণতন্ত্র এবং নীতিগুলিকে বাদ দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উভয়ের সমন্বয় সাধনের ভিত্তিতেই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি সম্ভব।

AMBITION

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **৬ x ৪ =২৪**

ক) ভারতের সংবিধানের ছ'টি মূল বৈশিষ্ট্য লিখুন।

ভারতীয় সংবিধান রচনার গোড়াপত্তন অনেক আগে শুরু হলেও তা কার্যকরি হয় 1950 এর 26 জানুয়ারী। ভারতীয় সংবিধান হলো জটিল ও বৃহত্তর সংবিধান। প্রতিটি দেশের সংবিধান ঐ দেশেরই দর্পণ স্বরূপ। সংবিধানের মাধ্যমেই প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্য গুলি নির্দেশ করে। তেমনি ভারতীয় সংবিধানেও কিছু উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

সংবিধানের প্রস্তাবনা ঃ– ১৯৪৯ এর ২৬ শে নভেম্বর ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রস্তাবনাতে ভারতকে শুধুমাত্র এক 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' বলা হয়। পরে ১৯৭৬-এর ৪২ তম সংশোধনীতে বলা হল, ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (বা সাধারণতন্ত্র)। প্রস্তাবনার পুরো কথাটি হল : " আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈকিত ও রাজনৈতিক ন্যায়াবিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।" বলা বাহুল্য, এই 'সংকল্প বাক্য ' বা প্রস্তাবনাই ভারতীয় সংবিধানের মূল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। ঠাকুরদাস ভার্গব লিখেছেন : ভারতীয় সংবিধানের এই প্রস্তাবনা হল এই সংবিধানের আত্মা। প্রস্তাবনা ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য হলেও এর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য এককথার জটিল ও বহুধাবিস্তৃত। সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান ঃ– ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম এবং সে কারণে জটিলতম। জন্মলগ্নে সংবিধান মোট ৩৯৫টি ধারা, বহুশত উপধারা ও ৮টি তপশিল নিয়ে রচিত হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত এই সংবিধান ৭৯ বার সংশোধিত হয়ে ৪৫০টি ধারা, বহুশত উপধারা ছাড়া ও ১২টি তপশিল নিয়ে আরও বড়ো আকার ধারণ করেছে। এত বড়ো হওয়ার মূল কালণ হল, এই সংবিধানে বিস্তৃতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একক ক্ষমতা, যৌথ ক্ষমতা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন অর্থাৎ পৌর, পঞ্চায়েতরাজ সম্পর্কে নির্দেশাবলি রয়েছে; কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সর্বোপরি, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিস্তৃত তথ্যসহ বহু নির্দেশাত্মক নীতি উল্লিখিত রয়েছে।

নির্দেশ বা নির্দেশাত্মক নীতি ঃ– ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি কাম্য অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানে কাজ পাওয়ার অধিকার, বার্ধক্য, অক্ষমতা বা পীড়িত অবস্থায় সরকারি ভাতা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি উল্লেখিত আছে। তবে, এগুলির জুন্য আদালতে যাওয়া যায় না।

সংবিধানের প্রাধান্য ঃ– ভারতীয় সংবিধান এককথায় দেশের মৌলিক তথা সর্বোচ্চ আইনের ধারক ও বাহক। সরকারের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস হল এই সংবিধান। দেশের আইনবিভাগ, বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগসহ সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধে সংবিধান।

Edition 2017

একনাগরিকত্ব ঃ– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক একাধারে নিজ দেশ ও নিজ অঙ্গরাজ্যের নাগরিক হতে পারে। ভারতের নাগরিক কোনোভাবেই নিজ অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র নাগরিক হতে পারে না। এই বিষয়টিকেই বলা হয় একনাগরিকত্ব।

জনজাতির জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ– তত্ত্বগতভাবে ভারতের সব নাগরিক সমমর্যাদা ও সমান সুযোগসুবিধা লাভের অধিকারী। এতৎ সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান সমাজের অনুন্নত জনজাতি হিসেবে তপশীলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ দানের ব্যবস্থা রেখেছে। কেন্দ্র ও

রাজ্যের আইনসভাসহ সমস্ত প্রতিনিধিকত্বমূলক সংগঠন, সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আর্থিক আনুকূল্যসহ অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। বলা আছে যে, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কয়েকটি রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ঃ– সংবিধানের প্রথম দিকে ৫৫২ টি দেশীয় রাজ্য ভারতের মূল ভূখন্ডে যোগদানের পরও কিছু বিশেষ সুবিধা পেত। পরে অবশ্য এ সমস্ত রাজ্যের বিশেষ সুবিধা বিলোপ করা হয়। তবে সংবিধানের ৩৭০ নং ধারায় কাশ্মীর ও ৩৭১ নং ধারায় অসম, মণিপুর, সিকিম ওনাগাল্যান্ডের জন্য বিশেষ পর্যায়ে কিছু স্বার্থ সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ঃ– সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শিক্ষা-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছরের (আগে ২১ বছর ছিল) ঊর্ধ্বে সকল ভারতীয় সমান ভোটাধিকার বর্তমান।

নগরিকদের কর্তব্য ঃ– সংবিধানে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে সংবিধান মান্য করা, জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা, ঐক্য, সংহতি, দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করা, নারীজাতিকে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করা, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা সহ হিংসার পথ পরিহার করার কথা বলা হয়েছে।

ভারতের জাতীয় পতাকা ঃ– স্বাধীনতা লাভের আগেই ১৯৪৭-এর ২২ জুলাই ভারতের গণপরিষদ স্বাধীন দেশের জন্য ত্রিবর্ণ রঞ্জিত, ধর্মচক্র শোভিত পতাকাটি অনুমোদন করে। এই পতাকা ভারতের শাশ্বত আদর্শের প্রতীক। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩:২ অনুপাতের পতাকার ওপরে গৈরিক বা জাফরাণ বর্ণ রয়েছে, যা ত্যাগের প্রতীক; মাঝখানে শ্বেত-শুভ্রবর্ণ, যা শান্তি, মৈত্রী ও সংযমের প্রতীক; এবং নীচে গাঢ় সবুজ বর্ণ, যা সাহস, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। পতাকার কেন্দ্র স্থিত অশোকের ধর্মচক্র একাধারে ন্যায় ও অগ্রগতির প্রতীক। এই চক্রের চব্বিশটি দণ্ড দিনের চব্বিশ ঘণ্টার দ্যোতক।

খ) ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যগুলি চিহ্নিত করুন।

উ ঃ——স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময় গনপরিষদের সদস্যদের সামনে ভারতীয় নাগরিকতার বিষয়টি সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।তাই সংবিধানের নাগরিকতা বিষয়ে কোন বিশদ আলোচনা নেই তবে সংবিধানের ১১ নং ধারা অনিসারে এ বিষয়ে সকল ক্ষমতা পার্লামেন্টেটর হাতে দেওয়া হয়।এই ক্ষমতাবলে ভারতীয় পার্লামেন্টেট ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইন পাশ করে এবং ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে সেই আইনের সংশোধন করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান চালু হয় ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী।সংবিধান প্রবর্তনের প্রাক্কালে কারা এবং কোনশর্তে ভারতের নাগরিক বলে গন্য হবেন সে বিষয়ে সংবিধানের ৫ থেকে ১১ ধারার মধ্যে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।নাগরিকতা অর্জনের ব্যাপারে সংবিধানের তিন রকম ব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

সংবিধানের ৫ নং ধারায় একথা বলা হয়েছে যে,সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় যারা ভারত ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং ((ক))যারা ভারতীয় ভূখন্ডে জন্মগ্রহন করেছে ,অথবা ((খ))যাদের পিতামাতার যে কোন একজন ভারতীয় ভূখন্ডে জন্মগ্রহন করেছে ,কিংবা ((গ))সংবিধান কার্যকর হওয়ার অন্ততঃ ৫ বছর পূর্ব থেকে যারা সাধারনভাবে ভারতীয় ভূখন্ডে বসবাস করছে,তারা ভারতীয় নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।অর্থাৎ স্থায়ী সাসিন্দা এবং ভারতীয় ভূখন্ডে জন্মগ্রহনের শর্তকে ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা অর্জনের দুটি প্রধান শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সংবিধানের ৬ এবং ৭ নং ধারায় পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তিদের নাগরিকতা প্রদানের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।৬ নং ধারা অনুসারে পাকিস্তান থেকে আগত কোন ব্যক্তি সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় ভারতীয় নাগরিক বলে বিবেচিত হবে যদি (১))সে নিজে অথবা তার পিতামাতার একজন অথবা তার পিতামহ -পিতামহী বা মাতামহ -মতামহীর যে কোন একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহন করে এবং (২))সে ১৯৪৮সালের ১৯শেজুলাই এর পূর্বে ভারতে চলে আসে।

ঙ) ভারতের দলব্যবস্থার যেকোনো চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো দলীয় ব্যবস্থা। সংসদীয় গণতন্ত্রে কার্যতঃ রাজনীতিক দলের সাহায্যেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র অচল। দলহীন গণতন্ত্র কল্পনা বিলাস বই কিছু নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতিক দলের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এডমন্ড বার্ক () বলেছেন "কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জন সমষ্টিকে রাজনীতিক দল বলা হয়।"

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে দলীয় ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানুসারে দলীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। একারণে প্রত্যেক দেশের দলীয় ব্যবস্থার

AMBITION
Edition 2017

কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক দলব্যবস্থারও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে —

সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতের

দলব্যবস্থার ভিত্তি ঃ– ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কোনো উল্লেখ নেই। তবে সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এই সংসদীয় গণতন্ত্রই হলো ভারতের দলব্যবস্থার ভিত্তি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ভারতে একটি রাজনৈতিক দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

সাম্প্রদায়িক দল ঃ– ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক দল গুলির মধ্যে মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আকালীয় দল, রামরাজ্য পরিষদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই দলগুলি স্ব স্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। তবে এই দলগুলির কোনো ভবিষ্যৎ বা জাতীয় দলের মর্যাদা লাভের আশা নেই। শান্তানাম (K. Shantanam) মন্তব্য করেছেন "Communal Parties in the long run have no future whatsover"। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের দলীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেদন-নিবেদন পরিতাপের বিষয়।

ভাষাভিত্তিক

আঞ্চলিক দল ঃ– ভাষার ভিত্তিতে কোনো কোনো রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাভিত্তিক দলের মধ্যে তামিলনাড়ুর D.M.K, A.I.D.M.K. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গোর্খালীগ ও ঝাড়খন্ড এবং অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির কথাও বলা যায়।

গণতন্ত্র অগণতান্ত্রিক ঃ– তত্ত্বগত বিচারে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মূলত গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কাঠামো গণতান্ত্রিক নয়। ভারতের দলব্যবস্থার এটা একটা বড় ত্রুটি। অধিকাংশ দলেরই সাংগঠনিক নির্বাচন অনেক দিন হয়নি। তার ফলে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানসিকতা দুর্বল হচ্ছে।

চ) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের গঠন আলোচনা করুন ।

1973 সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পশ্চিমবঙ্গে ত্রি-স্তর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ, ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে সমিতি। আগেকার আঞ্চলিক পরিষদের জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতি গুলি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকের জন্য একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি আছে। বর্তমান পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রতিটি জেলা কতকগুলি ব্লকে বিভক্ত। একাধিক পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিয়ে প্রতিটি ব্লক গঠিত হয়। প্রত্যেক ব্লকে একটি পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। ব্লকের নামানুসারে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির নামকরণ করে থাকেন।

গঠন ঃ– পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয় কয়েক শ্রেণীর সদস্যদের নিয়ে।

(১) ব্লক এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন।

(২) ব্লক এলাকা বা তার কোন অংশ থেকে নির্বাচিত বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যগণ এবং ব্লক এলাকায় বসবাসকারী রাজ্য সভার সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদ পান। তবে কোনো মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না।

(৩) ব্লক এলাকার গ্রাম গুলি থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে সদস্য নির্বাচিত। প্রতি আড়াই হাজার ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য — এই হারে প্রতি গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে আনধিক তিনজন সদস্য নির্বচিত হন। বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতিতে সাড়ে চার হাজার ভোটদাতা পিছু একমাস সদস্য নির্বাচিত হবেন। সাড়ে চার থেকে 'নয়' হাজার ভোটদাতার জন্য দু'জন সদস্য নির্বাচিত করেন।

(৪) নতুন পঞ্চায়েত আইনানুসারে পঞ্চায়েত সমিতিতে ও মোট আসনের একের তিন অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্যও প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

(৫) কোনো ব্লকের অন্তর্গত নির্বাচনী এলাকা থেকে জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যরাও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হবেন। কিন্তু জেলা পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাধিপতি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

AMBITION
Edition 2017